দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি: পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ

লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে লোকায়ত মানুষের যাপনচিত্রের মূল নকশা ধরা থাকে। এই সমস্ত দেবদেবী লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের মৌন সাক্ষী। মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের নানা চিন্তাভাবনা থেকে শুরু করে কামনার বিচিত্র প্রকাশ এই দেবদেবীকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লৌকিক দেবদেবীর থান দেখতে পাওয়া যায়। লৌকিক দেবদেবীর থান লোকায়ত মানুষের কেবলমাত্র ধর্মের পরিসর নয়। লৌকিক দেবদেবী মানুষের প্রতিদিনের নানা সমস্যা, চাহিদা থেকে শুরু করে সুখ-দুঃখের সহায়। লৌকিক দেবদেবীর থান গ্রামের মধ্যে, রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে বা গ্রামের প্রান্ত সীমানায় দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গের 'গ্রাম্য দেবদেবী' ও 'আঞ্চলিক দেবদেবী'র থান মানুষের জীবন-জীবিকার কারণে গড়ে উঠেছে। জল-জঙ্গল ঘেরা এখানকার মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে বাঁচতে হয়। এই সর্বাত্মক অসহায় পরিস্থিতিতে মানুষ কোনো শক্তির কাছে আশ্রয় নিতে চেয়েছে। মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তাজনিত চাহিদা থেকে দক্ষিণবঙ্গের বহু লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরি হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবী লোকায়ত মানুষের প্রজননকেন্দ্রিক, উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা থেকে উঠে এসেছে। লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপনের নানা চিহ্ন ঐতিহ্য-পরম্পরায় বাহিত। এই দেবদেবী যে মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন থেকে উঠে এসেছে, তা দেবদেবীর পূজাচার ও মূর্তিভাবনার মধ্যে ধরা পড়ে। ফলে এই দেবদেবীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড়। লৌকিক দেবদেবীর থান প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে অবস্থানের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের আদিম প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনযাপনের মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়।

দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থান বাংলার ইতিহাসের বিশাল কালপর্বকে ধারণ করে আছে। লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের নানা বিস্মৃত অধ্যায় সামনে চলে আসে। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থান

নির্মাণে পাল ও সেন যুগ থেকে শুরু করে মুসলমান শাসকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেখা যায়। থানকেন্দ্রিক আখ্যানে তাই বল্লাল সেন, আলীবর্দী খাঁ প্রভৃতি শাসকের নাম ফিরে ফিরে আসে। বাংলার জমিদারি শাসন কালে বহু লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বহু থান তৈরিতে জমিদারের সরাসরি হস্তক্ষেপ দেখা যায়। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চল তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারার মধ্য দিয়ে লৌকিক দেবদেবীর থানকে জীবন্ত করে রেখেছে। লোকায়ত মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক, উর্বরতাকেন্দ্রিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উঠে আসা এই দেবদেবীর থানে পালিত আচার-অনুষ্ঠানে পরিবেশেচিন্তার নানা দিক প্রকাশিত হয়। লৌকিক দেবদেবীর থানে পালিত আচার-আচরণ, পূজা-পদ্ধতি ও দেবদেবীকেন্দ্রিক মৌখিক আখ্যানে পরিবেশ সংরক্ষণ ভাবনা প্রকাশিত হয়।

"দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি: পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ" শিরোনামে গবেষণাপত্রটি চারটি অধ্যায়ে বিভাজিত। গবেষণার প্রথম অধ্যায় হল— 'ভারতে পরিবেশ ভাবনার বিবিধ ধারা-বৈচিত্র'। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম— 'দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থান: স্বরূপ ও বিবর্তন'। এছাড়া গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হল— 'ক্ষেত্রসমীক্ষা: পদ্ধতি, সমীক্ষা ও প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ'। গবেষণার চতুর্থ অধ্যায় হল— 'থানকেন্দ্রিক আখ্যান: পরিবেশবাদী দৃষ্টিতে বিচার ও বিশ্লেষণ'। এছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত মৌখিক আখ্যানগুলির লিখিতরূপ 'পরিশিষ্ট'-এ রাখা হয়েছে।

গবেষণার ***প্রথম অধ্যায়ে*** ভারতে পরিবেশ ভাবনার ধারা-বৈচিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণার মৌলিক জিজ্ঞাসা লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতিতে লোকায়ত মানুষের পরিবেশভাবনা কীভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে তার স্বরূপ পাঠ করা। ফলে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারতের পরিবেশ ভাবনার ধারা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে, ভারতীয় সভ্যতার একটি বড় দিক হল ধর্ম। প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ প্রকৃতিকে কখনোই নিজের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবেনি বরং ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ প্রকৃতির কোলেই গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনদর্শনে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের গভীর আত্মীয়তার টান অনুভব করেছে। আর সেইজন্য প্রকৃতিকে তারা অপর হিসেবে ভাবেনি। প্রকৃতি থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় উপাদান শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে লুণ্ঠনকারী মানসিকতা দ্বারা এই সময়ের

মানুষ সংগ্রহ করেনি; পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। পরিবেশের সমস্ত প্রাণের প্রতি সমান মমত্ববোধ প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনদর্শনে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। পরিবেশের উপাদানকে মানুষ নিছক কোনো জড় বস্তু বলে মনে করেনি। মানুষ পরিবেশের সমস্ত উপাদানকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে, সজীব ভেবে পুজো করেছে। মানুষ এই পর্বে প্রকৃতিকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাঠ করছে তা বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে জানা যায়। বৈদিক সাহিত্যে প্রকৃতির অপার দানকে নানা ভাবে বর্ণনা করতে দেখা যায়। বেদের নানা সুক্তে প্রকৃতিকে রক্ষা করার কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে মানুষ প্রকৃতিলগ্ন হয়েই জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছে। এই সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি কিছু চাওয়ার মানসিকতা চোখে পড়ে না। আসলে ভারতবর্ষের আধাত্মিক পরিবেশে ভোগকেন্দ্রিক জীবনযাপন প্রাধান্য পায়নি। ফলে আজকের সময়ে যখন পাশ্চাত্যের ভোগকেন্দ্রিক মানসিকতার জন্য পরিবেশ চমরভাবে বিপন্ন হচ্ছে প্রাচীন ভারতের তেমন কিছু দেখা যায় না আর এইজন্য প্রাচীন ভারতে পরিবেশচিন্তার আলোচনা প্রাসঙ্গিক ও জরুরি। অধ্যায়ের শুরুতেই প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের আলোচনার মধ্য দিয়ে আজকের সময়ে পরিবেশ বিপন্নতার স্বরূপকে সম্যকভাবে বোঝা যায়। আমরা জানি প্রকৃতির নিজস্ব সত্তা আছে। এখানে প্রকৃতি নিজেই সম্পূর্ণ। কিন্তু এই প্রকৃতির অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে মানুষের নৈতিক বিচারের মানদণ্ডে। এই প্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে জানলে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণা কীভাবে বদল হচ্ছে তার ইতিহাস জানা সম্ভব হয়। আবার পরিবেশ সম্পর্কে বলা হয়, মানুষ যে পরিমণ্ডলে বাস করে তার চারপাশের সমস্ত পরিসরের সমবায়েই এর অস্তিত্ব। প্রকৃতি যেমন তার আপন অস্তিস্ব নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরিবেশ সেই তুলনায় অনেকখানি নির্ভর করে মানুষের হস্তক্ষেপের উপর। মানুষ তার চারপাশের পরিসরকে যেমন করে সাজাবে তার উপর নির্ভর করেই পরিবেশ আকার ধারণ করে। পরিবেশের ভালো-মন্দের উপর মানুষের হাত অনেকাংশে কাজ করে। প্রকৃতি মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া গঠিত হয়। কিন্তু পরিবেশ গড়ে ওঠে মানবিক নানা সংগঠনের সমবায়ে। এই কারণে বাড়ির পরিবেশ, গ্রামের পরিবেশ বা স্কুল-কলেজের পরিবেশের কথা প্রচলিত হয়েছে। পরিবেশ বিপন্নতার সময়ে দাঁড়িয়ে তাই খুব জরুরি হয়ে পড়ে ভারতীয় ঐতিহ্যগত পরিবেশ ভাবনাকে ফিরে দেখা। এই অধ্যায়ে বেদ, রামায়ণ, মহাভারতে মানুষের প্রকৃতি নিয়ে

চিন্তাভাবনার কথা আলোচনা করা হয়েছে। বৈদিক যুগ ও তার পরবর্তী সময়ে মানুষ প্রকৃতিকে পুজো করেছে। এই সময়ে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়েই। বেদের সময় মানুষ সমস্ত কাজকর্মে প্রকৃতির অবদানকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে। বেদের নানা সূক্তে দেখা যায় প্রতিটি দেবতা কোনো না কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বেদের সূক্তে যে দেবতার বন্দনাগান আছে তাতে একই সঙ্গে যেমন দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা দেখা যায় তেমন করে আবার সেই দেবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীকে মাতারূপে কল্পনা ও তার সঙ্গে আকাশের মিলনের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবী শস্যবতী হওয়ার বর্ণনায় বৈদিক মানুষের যে মনোভাব পাওয়া যায় তা আজকের সময়ে সঙ্গে মেলে না। আজকের সময়ে পরিবেশ বিপন্ন তার বড় কারণই হল মানুষের প্রকৃতি থেকে নির্বিচারে শোষণ করার মানসিকতা। বৈদিক সমাজ পৃথিবীকে মাতার সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে তার সন্তান ভেবে, তার কাছে শস্য থেকে জীবনের নানা প্রয়োজন প্রার্থনা করেছে। এই মানসিকতার জন্য বৈদিক যুগে পরিবেশ বিপন্নতার মুখোমুখি হয়নি। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা ধরা পড়েছে । যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদকে কোনোভাবেই জোর করে নেওয়া নয় ; প্রাকৃতিক সম্পদকে নানা আচার-অনুষ্ঠান ও আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়েই পেতে চেয়েছে। বেদের বিভিন্ন জায়গায় পৃথিবীকে মাতা ও আকাশকে পিতা বলা হয়েছে। এই মাতা ও পিতার যৌথ মিলনের ফসল হল পৃথিবীর সমস্ত সন্তান। বেদে কেবল পৃথিবীর স্তবগান দেখা যায় না। এখানে একইসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ ও অ-প্রাণের প্রতি সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা। এই একই ভাবনার বিস্তার দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক পরিবেশে সমস্ত উপাদানের উপর বৈদ মহিমা আরোপের মধ্য দিয়ে মানুষ আসলে পরিবেশের সংরক্ষণের কথা পরোক্ষভাবে উচ্চারণ করেছে। তাই প্রাচীন ভারতে পরিবেশের শৃঙ্খলায় তেমন কোনো গুরুতর সমস্যা দেখা যায় না। এই অধ্যায়ে *রামায়ণ, মহাভারতের* যুগে মানুষের পরিবেশ ভাবনাকে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আলোচিত হয়েছে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে প্রকাশিত পরিবেশভাবনার স্বরূপ। জৈনধর্ম থেকে শুরু করে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রকৃতি বড় অংশ জুড়ে আছে। গৌতম বুদ্ধের জন্ম, নির্বাণ থেকে শুরু করে সমাধি পর্যন্ত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে। এই পর্বে মানুষের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে

বিশেষ জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রকৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই দুই ধর্মের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকলেও মোটের উপর প্রকৃতিকে রক্ষা, সংরক্ষণ ও বিস্তারের উপর সবাই জোর দিয়েছেন। জৈন ধর্মে 'সর্বপ্রাণবাদ'-এর উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। জৈনধর্মে বিশ্বের সমস্ত উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়— জীব ও অজীব। কিন্তু এই দুইয়ের অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপর। জৈনধর্মে প্রকৃতির প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই ধর্মে বলা হয়, প্রাণ ও অপ্রাণ মিলিয়ে মানুষ এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাই মানুষের নৈতিক দায়িত্ব হল এই সমস্ত উপাদানের সংরক্ষণ করা। জৈনধর্ম থেকে শুরু করে বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হল অহিংসা। এই অহিংসা, পরিবেশের সমস্ত প্রাণ ও অপ্রাণের প্রতি বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ধারণা থেকেই জৈনধর্মের 'সর্বপ্রাণবাদ' ধারণার উদ্ভব। মানুষের ভোগকেন্দ্রিক মানসিকতার জন্য আজকের সময়ে পরিবেশ বিপন্ন। এছাড়া মানুষ প্রয়োজনের বাইরে গিয়ে সঞ্চয়কেন্দ্রিক মানসিকতার জন্য প্রকৃতি তার বিপুল সম্পদ নিয়েও নিঃস্ব হতে বসেছে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে মানুষের এই মানসিকতাকে সমালোচনা করা হয়েছে। জৈনধর্মে বলা হয়েছে যে, ভ্রমর যেমন করে ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করে ফুলের কোনো ক্ষতি না করেই, তেমন করে মানুষকেও প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নিতে হবে। জৈনধর্মে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে, যেখানে বলা হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ বা সমস্ত কিছু একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল এবং একটির পতন অন্য প্রাণের অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন করে তোলে। বাস্তুতন্ত্রে বলা হয় যে পরিবেশের সমস্ত উপাদান শৃঙ্খলিত ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তাই একে অপরের সংরক্ষণ খুবই জরুরি। জৈনধর্মে ঠিক এই কথাই বলা হয়। এই দুই ধর্মভাবনায় মানুষের দুঃখের কারণ হিসেবে মানুষের ভোগবাদী চিন্তাভাবনাকে দায়ী করা হয়েছে। আর এই ভোগবাদী চিন্তার জন্যই মানুষ প্রকৃতিকেও ভোগ্যপণ্য করে তুলেছে। এই দুই ধর্মমতে হিংসা ও ভোগ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে প্রকৃতি বিশেষ স্থান পেয়েছে। গৌতম বুদ্ধ জীবনের সমস্ত প্রজ্ঞা লাভ করেছেন প্রকৃতির শান্ত সমাহিত পটভূমিকায়। বৌদ্ধধর্মে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে দূরে গিয়ে সবার জন্য ভাবার কথা বলা হয়েছে। আর এই একই বিষয় তাদের ধর্মভাবনায় বিশেষ স্থান লাভ করেছে। বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতিতে পরিবেশ নিয়ে যে আলোচনা বা চিন্তাভাবনার কথা আছে তার নিরিখে 'ডিপ ইকোলজি'র তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধধর্মে

পরিবেশে বসবাসকারী জীবজ ও অজীবজ উপাদানের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রকৃতি পবিত্র। বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনার মধ্যে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদকে সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। এবং পরিবেশে প্রত্যেকের বাঁচার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বৃক্ষ ও বনভূমিকে সংরক্ষণ করা বৌদ্ধধর্মে আধ্যাত্মিক কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এই বিশ্বকে 'গৃহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'গৃহ' কারাগারের সমার্থক শব্দ নয়। এই গৃহের ধারণা অনেক ব্যাপ্ত, কোনো বদ্ধতার কথা এই গৃহের ধারণায় আসে না। এই ধর্মে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষ জন্মের পর ও মৃত্যুর পরেও এই গৃহে আশ্রয় নেয়। আসলে এই গৃহের ধারণার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ থেকে তার সমস্ত পরিসরকে একটি সমবায়ের মধ্যে আনতে চেয়েছে। বৌদ্ধধর্মের 'ধম্ম'র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বন ও বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করা। বৌদ্ধধর্মের পরিবেশ-বিষয়ক চিন্তার মূল কথা হল পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে সমান মর্যাদা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা। এরপর এই অধ্যায়ে লোকায়ত দর্শনে পরিবেশভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লোকায়ত মানুষ বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় করতে নানা জাদুবিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারস্থ হয়েছে। লোকায়ত মানুষ বিভিন্ন অলৌকিকতা ও জাদু বিশ্বাসকে নির্ভর করে আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ তৈরি করেছে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দলবদ্ধ মানুষের পরিবেশভাবনা প্রকাশ পেয়েছে আর এই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর পরবর্তী সময়ে দেবত্ব আরোপ করেছে। লোকধর্মে প্রকৃতিপূজার প্রাধান্য সেই প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। কৃষি ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য এরা প্রকৃতিপূজার সঙ্গে ধর্মভাবনা যুক্ত করেছে। লোকায়ত সমাজের ধর্মভাবনার মূলে আছে প্রকৃতিকে পূজা। লোকায়ত সমাজ পরিবেশ থেকে নানা উপাদান নেওয়ার জন্য বিভিন্ন জাদুবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়েছে। জীবনে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়ার জন্য এই সমাজ অনুকরণমূলক,স্পর্শমূলক আচার-আচরণের দ্বারা চালিত হয়েছে। এবং এই মানসিকতার জন্য পরিবেশের কোনো উপাদান তারা জোর করে বা ভোগকেন্দ্রিক মানসিকতার দ্বারা সংগ্রহ করে না। ফলে এই সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক সবসময় পারস্পরিক সহাবস্থানের হয়ে থাকে। আজকের সময়ে বৃষ্টি হওয়া ও না হওয়ার কারণ হিসেবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখা হয়। এবং বৃষ্টি যাতে হয়, বৈজ্ঞানিক ভাবে যাতে তার বাস্তবায়ন হয় তার চেষ্টা করতে দেখা যায়। কিন্তু লোকায়ত মানুষ এই দিকে পা বাড়ায় না। লোকায়ত মানুষের যদি বৃষ্টি

দরকার হয় তাহলে বিজ্ঞানের থেকে লোকবিজ্ঞানের উপর বেশি বিশ্বাস করে। এবং লোকায়ত সমাজ নানা অনুকরণমূলক আচার-আচরণের দ্বারা বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তাই লোকায়ত সমাজ কোনো ভাঁড়ে ছিদ্র করে সেখান থেকে বৃষ্টির অনুকরণ করে বা ব্যাঙের বিয়ে দেয়। এবং তারা বিশ্বাস করে এর ফলে বৃষ্টি হবে। ফলে আজকের সময়ে যখন মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ভর করে প্রকৃত সত্য জানতে পারছে তেমন করে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাকে বিপন্ন বা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যা লোকায়ত মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। এই সমস্ত স্পর্শমূলক ও আচরণমূলক আচার-অনুষ্ঠান তৈরি হয়েছে প্রাক-বৈদিক যুগে। আর্যরা ভারতে এসে এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান থেকে অনেক কিছু নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। আজকের সময়ে বট অশ্বত্থ থেকে নানা ধরনের বৃক্ষ-পূজার মধ্যে আদিবাসী, অনার্য নরনারীর পালিত আচারের স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে মানুষের প্রকৃতির অন্য প্রাণকে রক্ষা ও সংরক্ষণের বিষয় ধরা আছে। ফলে বলা যায় যে, লোকায়ত সমাজের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার মূল বীজমন্ত্র লুকিয়ে আছে।

ভারতীয় সভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উৎপাদনের ধরন-ধারণ বদল হয়। এই উৎপাদনের ধরন বদলের জন্য মানুষ প্রকৃতিকে সম্পদের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। এর অনিবার্য ফল হিসেবে পরিবেশ বিপন্নতার সূত্রপাত হয়। বেদের সময়ে পরিবেশের শৃঙ্খলা বা ভারসাম্য পুরোপুরি অটুট ছিল বলা যায় না। কিন্তু সেই সমস্যা আজকের সময়ের মতো বিরাট আকার ধারণ করেনি। বর্তমানে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজের মুনাফার জন্য অবাধে লুট করে চলেছে আর এইজন্য ভারত তথা বিশ্বপরিবেশ আজ বিপন্ন। পরিবেশ বিপন্নতার সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নানা আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই অধ্যায়ে ভারতে সংগঠিত কয়েকটি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'বিশনয়ি'দের পরিবেশ আন্দোলন সবার প্রথমে আলোচিত হয়েছে। এই সম্প্রদায় বৃক্ষ তথা পরিবেশের সমস্ত উপাদানকে পরম যত্নে লালনপালন করেন। পরিবেশ রক্ষার জন্য পরবর্তী সময়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে। এবং পরিবেশকেন্দ্রিক আন্দোলনের জন্য অনেকের প্রাণ গিয়েছে। এই পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন, তার হাতেখড়ি এই বিশনয়িরা প্রথমে শিখিয়েছে বলে মনে করা হয়। গাছ ও পশুদের জন্য আত্মদানের কাহিনি শোনা যায় ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে অমৃতাদেবীর গাছ রক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়ার ঘটনার মধ্যমে। যোধপুরের রাজা অভয়

সিংহের বাড়ির মেরামতির জন্য খেজরালি গ্রামে গাছ কাটতে যায়। অমৃতাদেবী এই গাছ কাটার প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ স্বরূপ নিজের প্রাণ দেন। এরপর এই আন্দোলন পাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এবং এই পরিবেশ আন্দোলনের জয় হয়। আসলে এই সম্প্রদায় প্রকৃতির সমস্ত প্রাণকে রক্ষা করার কথা বলেছে। এই ধর্মের গুরু কৃষ্ণসার হরিণকে মারতে বারণ করেছেন। কেননা এই হরিণ গুরুর অবতার। পৃথবীতে কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়কে প্রকৃতির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে দেখা যায়নি। এই দিক থেকে বিশনয়িদের এই আন্দোলন আজকের সময়ে পরিবেশবাদী আন্দোলনে অন্য মাত্রা যোগ করে। আসলে এই বিশনয়িদের ধর্মে প্রকৃতির বড় ভূমিকা গ্রহণের কারণ হল এদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এককালে যখন এরা প্রকৃতির কোলে লালিতপালিত হয়েছে তখন বুঝতেই পারেনি প্রকৃতির অবদানকে। তাই এরা নির্বিচারে প্রকৃতিকে নিধন করেছে। যখন সেই সবুজ গ্রাম খরা ও অনাবৃষ্টির কবলে পড়ল তখন তারা সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে এই সম্প্রদায়ের প্রকৃতিকে পুজো ও তাকে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নিজের জীবন থেকে উঠে আসা অভিজ্ঞতার ফল হিসেবেই ধরা হয়।একইভাবে চিপকো আন্দোলন পরিবেশ রক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। নারীর সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পর্ক, এই আন্দোলন সেই ঐতিহ্যের কথা বলে। এই আন্দোলনে বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে, বৃক্ষ নিধনের বিরুদ্ধে নারীর যে প্রতিবাদ তার মাধ্যমে বলা হয় যে, বৃক্ষকে কাটা মানে নারীর জীবন্ত অস্তিত্বকে লোপাট করার সামিল। এই আন্দোলনে মেয়েরা অরণ্যের সম্পদকে বাইরের মুনাফাকামী ব্যবসায়ীদের থেকে রক্ষা করে ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের মৌলিক প্রশ্ন হল অরণ্য কী দেয়? উত্তরে বলা হয় অরণ্য জল, মাটি আর নির্মল বাতাস দেয়। আর এই সমস্তের সমবায়ে বেঁচে থাকে বন্যপ্রাণ থেকে মানুষের যাবতীয় অস্তিত্ব। চিপকো আন্দোলনে নারীর অবস্থানই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে চিপকো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ রক্ষার জন্য সংগঠিত আন্দোলনের নানা স্তরকে দেখানো হয়েছে। এই অধ্যায়ে পরিবেশরক্ষার জন্য সংগঠিত আন্দোলনের বিভিন্ন অভিমুখ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবং এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের পরিবেশপাঠের ইতিহাসকে দেখা হয়েছে। চিপকো যেমন তুলে ধরে অরণ্যের প্রতি মানুষের নির্ভরতা, যেখানে মানুষ তাদের আজন্মের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপনের ধারাকে বজায় রাখতে আন্দোলন করেছিল। নিয়মগিরির পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্দোলন আবার একটি নতুন দিককে উন্মোচিত করে। উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি ও রায়গড় জেলায় যে বিস্তৃত শৈলমালা আছে,

তাকে কেন্দ্র করে এখানকার আদি জনজাতি কোন্ধদের ধর্ম-বিশ্বাস গভীরভাবে জুড়ে আছে। এরা বিশ্বাস করে এই শৈলমালায় 'নিয়ম' নামে দেবতার বাস। এই নিয়ম রাজার তাদের যাবতীয় দেখাশোনা করে। এই ধর্মের বিশ্বাস কেবলমাত্র ওই শৈল শ্রেণীতেই আবদ্ধ নেই। এই দেবতার প্রভাব বেশ কিছু এলাকা জুড়ে আছে। এই শৈল শ্রেণিতে যখন বক্সাইটের খনি পাওয়া যায় আর তা খনন করার কথা বলা হয় তৈরি হয় বৃহৎ আন্দোলনের পটভূমি। আসলে এখানে বক্সাইট খনন করলে এখানকার বাস্তুতন্ত্র চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে গোটা আন্দোলনটি ধর্মের মোড়কে মানুষের পরিবেশ সংরক্ষণের মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া এই অধ্যায়ে ভারতবর্ষের পরিবেশ বিপন্নতার মৌলিক কারণগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল রবীন্দ্রনাথের পরিবেশচিন্তা। ভারতবর্ষের পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। প্রাচীন ভারতের পরিবেশচিন্তা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। তিনি প্রাচীন ভারতে প্রকৃতির কোলে সভ্যতার বিকাশের কথা উল্লেখ করেছেন। আর এই কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতের পরিবেশে চিন্তার স্তর-পরম্পরাকে তুলে ধরেন। তিনি একই সঙ্গে আধুনিক নগর সভ্যতায় মানুষের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছন্নতার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন। ভারতের পরিবেশচিন্তার নির্ভরযোগ্য দলিল হল রবীন্দ্রসাহিত্য ও তাঁর চিন্তাভাবনা। আসলে রবীন্দ্রসাহিত্য ও পরিবেশ ভাবনার মাধ্যমে ভারতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ইতিহাস বুঝতে পারা যায়। ফলে ভারতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ধারা-বৈচিত্র পাঠে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

গবেষণার ***দ্বিতীয় অধ্যায়ে*** আলোচিত হয়েছে লৌকিক দেবদেবীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। লৌকিক দেবদেবী প্রসঙ্গে প্রথমেই 'আঞ্চলিক দেবতা' ও 'গ্রাম দেবতা' নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই অধ্যায়ে লোকধর্মের সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর সম্পর্কের ইতিহাস পাঠ করা হয়েছে। এই সমস্ত দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। লৌকিক দেবদেবীর মূর্তিভাবনার মধ্যে এই বিষয়ের হদিশ পাওয়া যায়। লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি-পূজার ক্ষেত্রে মিশ্র-পদ্ধতি দেখা যায়। কোনো কোনো দেবদেবী কেবলমাত্র প্রতীকে পূজিত হচ্ছেন আবার কোনো কোনো দেবদেবী প্রতীক ও মূর্তি সমানভাবে পূজিত হয়ে আসছে। মানুষ লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও এদের যে সমস্ত প্রতীকে পুজো দিয়ে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ১। শিলাখণ্ড ২। ঘট ৩। বৃক্ষ ৪। মুণ্ডমূর্তি ৫। পশুর

প্রতীক । এছাড়া মাটির ঢিবিকে লোকায়ত মানুষ দেবদেবী মনে করে পুজো দিয়ে থাকে। মানুষের মনে যখন কোনো মূর্তিভাবনা আসেনি তখন এই সমস্ত শক্তিকে বিভিন্ন প্রতীকে পুজো করে এসেছে। পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে শিল্পভাবনা থেকে শুরু করে ধর্মের উন্মেষ হয় তখন এদের মূর্তি-পূজা শুরু করে। ফলে লৌকিক দেবদেবীর মূর্তিভাবনার মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের দেবদেবীকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার স্তর-পরম্পরা পাওয়া যায়। লৌকিক দেবদেবী যে অনার্যদের দ্বারাই পূজিত হতেন তা এই দেবদেবীর মূর্তিভাবনায় প্রকাশিত। কেননা এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর রূপ ও স্বভাব আদিম, উগ্র মনোভাবাপন্ন। বাংলার লৌকিক দেবদেবীর উগ্রতা বিস্ফারিত চোখ ছাড়াও এই দেবদেবীর চোখের রং নির্বাচনে ধরা পড়ে। বহু লৌকিক দেবদেবীর চোখ রক্তের মতো লাল হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণবঙ্গের জাগ্রত ও অধিক পূজিত পঞ্চানন্দের মূর্তিভাবনা সম্পর্কে এই কথা বলা যায়। পঞ্চানন্দের উগ্র স্বভাব বোঝাতে বিস্ফারিত চোখের সঙ্গে চোখের রং লাল করা হয়। আবার কোনো কোনো দেবতার উগ্রতা বোঝাতে সামনের দু'টি দাঁত বের করা থাকে এবং এই দেবদেবীকে দেখে রাক্ষস বলে মনে হয়। অনার্যদের দেবদেবী বলেই এদের মূর্তিকে ভয়ঙ্কর করে আঁকা হয়েছে।

লৌকিক দেবদেবীর সাজসজ্জা এই দেবদেবীর মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবীর পোশাক-পরিচ্ছদ অঞ্চল ও ধর্ম ভেদে আলাদা হয়। দেবদেবীর পোশাক বহুক্ষেত্রে তাদের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে নির্বাচন করা হয়। যেমন দক্ষিণরায় যেখানে যোদ্ধা হিসেবে পূজিত হন সেখানে তাঁর পোশাক অনেকটা সেনাপতির মতো ঝকঝকে। বারুইপুরের ধপধপীতে দক্ষিণরায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই দেবতাকে বীর ও যোদ্ধার পোশাক পরানো হয়েছে ও এই দেবতার হাতে বন্দুক আছে। আবার কোনো কোনো স্থানে দক্ষিণরায়কে বাঘের দেবতা হিসেবে পুজো করার রীতি দেখা যায়। এই সমস্ত অঞ্চলে দক্ষিণরায় বাঘের উপর উপবিষ্ট ও সাধারণ পোশাক পরে পূজিত হন।

লৌকিক দেবদেবীর পোশাক-পরিচ্ছদে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সমস্ত দেবদেবীর পোশাক অনেক সময় শাস্ত্রীয় দেবতার মতো আড়ম্বরপূর্ণ হয় না। দক্ষিণবঙ্গের অনেক দেবতা দেখা যায়, যাদের হাঁটুর উপরে মলিন একখণ্ড ধুতি সম্বল এবং গায়ে অন্য কোনো বস্ত্র নেই। আবার কোনো কোনো দেবতার ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ধুতিকে কোমরের সঙ্গে আঁট করে রাখার জন্য গামোছা জড়ানো থাকে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পাঁচু ঠাকুরের এমন পোশাক দেখা যায়। এছাড়া পঞ্চানন্দের দুই সহচর

পেঁচো ও খেঁচোর পোশাক এইরকম হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো দেবতার ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা কেবলমাত্র ধুতি পরে আছেন। লোকায়ত মানুষ এই সমস্ত দেবদেবীর আদি উৎস মনে রেখে এদের গায়ে আড়ম্বরপূর্ণ বস্ত্র দান করেনি। আদিম মানুষ যখন বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত ও পোশাক পরার মতো সভ্য অবস্থায় আসতে পারেনি, সেই সময় থেকেই তারা এই সমস্ত দেবদেবীকে পুজো করে আসছে। আদিম মানুষ যেমন অরণ্যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রাকৃতিক ভাবেই থাকত, তেমন করেই তাদের পূজিত দেবতাদের তারা কল্পনা করে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মানুষ তথাকথিত সভ্য হলে ও সৌন্দর্যবোধের জাগরণ হলে পোশাক পরতে শুরু করে। কিন্তু লৌকিক দেবদেবী আজকের সময়েও তাদের মূল স্বরূপকে ভুলতে পারেনি বা মানুষ তাদের আদিকে ভুলতে চায়নি। ফলে প্রকৃতিলগ্ন এই সমস্ত দেবতা আজকের সময়েও প্রাকৃতিক ভাবে খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করেন। লৌকিক দেবীর ক্ষেত্রে ধর্মের নিরিখে পোশাক বদল হয়। উদাহরণ হিসেবে বনবিবির উল্লেখ করা যায়। যেখানে বনবিবি হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হন সেখানে এই দেবীর পোশাক বাঙালি হিন্দু ঘরের মেয়ের মতো। এখানে দেবী সুন্দর শাড়ি পরে থাকেন। এছাড়া গলায় হার ও মাথায় মুকুটের সঙ্গে সঙ্গে সারা অঙ্গে অলঙ্কার দিয়ে সাজানো থাকে। আবার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বনবিবির পোশাক একেবারে খানদানী মুসলমান ঘরের কিশোরীর মতো। এই দেবীর পরিধানে পিরান বা ঘাঘরা, পাজামা থাকে। এছাড়া পায়ে জুতো, মোজা থেকে শুরু করে চুল বিনুনি করা থাকে সঙ্গে ওড়নাও দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার লৌকিক দেবদেবীর পোশাক-পরিচ্ছদে নানা বিষয়ে সমাবেশ ঘটেছে। আবার লৌকিক দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি ও উপকরণের মধ্যে নানা স্তর দেখা যায়। বেদ পুরাণের আগে আদিম জনজাতিদের দ্বারা এই সমস্ত দেবদেবী পূজিত হত তা এদের পূজা-পদ্ধতি ও পূজার উপকরণ দেখলে বোঝা যায়। লৌকিক দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি ও পূজার উপকরণের প্রাথমিক স্তরে দেখতে পাওয়া যায় যে, এই সমস্ত দেবদেবীর পূজায় কোনো ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার নেই। এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোতে কোনো শাস্ত্রীয় বা নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। সাধারণত অব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজের মতো করে এদের পুজো করে থাকে। এছাড়াও থানের সেবক এদের পুজো করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এদের পুজোতে ব্রাহ্মণ প্রবেশ দেখা যায়। এছাড়াও এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোতে নানা মন্ত্র উচ্চারণ করতে দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবীর মূর্তির বিবর্তন ধারায় যেমন নানা পরিবর্তন এসেছে তেমন এদের পূজা-

পদ্ধতির নানা বদল হয়েছে। যে দেবতার আরাধনা ছিল একান্ত লোকায়ত মানুষের, অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নিজস্ব এলাকা; ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের প্রবেশের ফলে এর অনেক বদল ঘটে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোতে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অনুপ্রবেশ করুক না কেন এর মূল বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। আসলে যে কোনো ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হল নিজের বিপুল কলেবরে নানা গ্রহণ-বর্জন করেও নিজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অটুট রাখে।

লৌকিক দেবদেবীর পূজার উপকরণের মধ্যে এই সমস্ত দেবদেবীর আদি উৎস-রহস্য লুকিয়ে আছে। লৌকিক দেবদেবীর পুজোয় উপকরণ হিসেবে আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকার উপাদান দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবী পূজিত হয় গ্রামের নিম্নবিত্ত শ্রেণির দ্বারা। লৌকিক দেবদেবীর পুজোতে এই সমস্ত মানুষ অতি সামান্য ফলফুল ও ধানদূর্বা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চায়। লৌকিক দেবদেবীর নিত্য পুজোর দিনে সাধারণত এইরকম উপাচার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাৎসরিক পুজোর দিনে যে সমস্ত উপাচার দিয়ে এই সমস্ত দেবদেবীর পুজো করা হয় তার মধ্য দিয়ে এই দেবদেবী লোকায়ত মানুষের কত কাছের যেমন করে বোঝা যায় একইভাবে এই দেবদেবী যে মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন থেকে উঠে এসেছে তা পরিষ্কার হয়। লোকায়ত মানুষ বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নানা উপাচারের সঙ্গে এইসব দেবতাদের পুজো করে থাকে। লৌকিক দেবদেবীর পুজোতে উপাচার হিসেবে হাঁস, মোরগ, পাঁঠা বলি দেওয়া, পোড়া মাছ-কাঁকড়া দেওয়া, তরল পানীয় অর্থাৎ মদ দান করা ও সর্বোপরি এই সমস্ত দেবদেবীর হাতে তীর, ধনুক, মুগুর, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র থাকে ও পূজায় কোনোও শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। ফলে বোঝা যায় যে, এই দেবদেবী কোনোভাবেই শাস্ত্রীয় দেবদেবী নয়। আদিম অরণ্যচারী সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি জনজাতির দ্বারাই এইসব দেবদেবী পূজিত হত। কেননা এদের পূজা-পদ্ধতি ও উপাচার সবই আদিবাসী, বনবাসী সম্প্রদায়ের আচার-সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির যে বদল হয়েছে তা পরবর্তীকালে সংযোজনের কারণেই। ফলে এই অধ্যায়ে লৌকিক দেবদেবীর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই দেবদেবীর উৎপত্তির ইতিহাস দেখা হয়েছে। আবার এই দেবদেবীর মূর্তিভাবনা, পূজাচার ও পূজাচারের পদ্ধতি-উপকরণের বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে।

এই অধ্যায়ের লৌকিক দেবদেবীর থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থানের স্বরূপ থেকে শুরু করে এই থানের বিবর্তনের ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে প্রথমেই কাকে থান বলে তার আলোচনা করা হয়েছে। খোলা আকাশের নীচে, গ্রামের প্রান্তে বা রাস্তার ধারে কাঁচা বা পাকা কোনো লৌকিক দেবদেবীর আস্তানাকে থান বলা হয়। লৌকিক দেবদেবীর যে সমস্ত থান আছে তার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—

(ক) সাধারণত থানগুলি খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করে।

(খ) কিছু কিছু থান কোনো গাছের তলায় বা গাছের উপরেও থাকে। তাছাড়া ঘন বনজঙ্গল বা ঝোপঝাড়ের মধ্যেও লৌকিক দেবদেবীর থান থাকতে পারে।

(গ) থানগুলি সাধারণত রাস্তার ধারে বা গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত হয়।

(ঘ) থানের পাশে একটি গাছ বা পুকুর থাকা প্রায় অনিবার্য বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) কোনো কোনো জায়গায় একটি মাটির স্তুপ বা ঢিবিকে থান হিসেবে পুজো করা হয়।

(চ) থানগুলি প্রাকৃতিকভাবেই বিরাজ করে অর্থাৎ থানগুলিকে প্রতিদিন পরিষ্কার বা পুজো দেওয়া হয় না। সপ্তাহের বা বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে থানকে পরিষ্কার করা হয়। আপাতভাবে থানগুলোকে দেখে মনে হতে পারে যে এই লৌকিক দেবদেবীদের কেউ ভালোবাসে না।

(ছ) থানে দেবতার মূর্তি থাকতেও পারে আবার নাও পারে। কোনো কোনো থানে দেবতার মূর্তি হিসেবে এক খণ্ড পাথর বা মাটির ঢেলা পূজা করা হয়।

(জ) দেবদেবীর থানগুলি এককভাবে বা একত্রিতভাবে অবস্থান করে।

এই অধ্যায়ে লৌকিক দেবদেবীর থানের আভিধানিক অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের থানগুলি প্রতিটি পাড়ায়, গ্রামের প্রান্ত-সীমানা থেকে শুরু করে ঝোপঝাড় জঙ্গলের কাছে কেন তৈরি হয় তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থান নির্মাণে মানুষের জীবিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে এখানে কোন কোন কাজের নিরিখে দেবদেবীর থান তৈরি হয়েছে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দক্ষিণবঙ্গে যেসমস্ত মানুষের জীবন-জীবিকা জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। সেইসমস্ত অঞ্চলে বনবিবির থান বেশি দেখা যায়।

এই অধ্যায়ের শেষে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর থানের উৎপত্তি, স্বরূপ ও বিবর্তনের ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে পঞ্চানন্দের থানের উল্লেখ করা যায়— আদিগঙ্গার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পূজিত লৌকিক দেবতা হলেন পঞ্চানন্দ। এই লৌকিক দেবতার থান অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রাম ও পাড়ায় দেখতে পাওয়া যায়। এই দেবতার থানকে দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সর্বোপরি অর্থনীতির বিকাশের ধারাকে পাঠ করা যায়। দক্ষিণবঙ্গে পঞ্চানন্দের থান বিভিন্ন ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চানন্দের বেশ কিছু থান মাঠের ধারে, গ্রামের মধ্যে কোনো রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, বিভিন্ন গাছের তলায় খোলা আশের নীচে দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো থান পাকা অর্থাৎ ছাদযুক্ত থান। আবার কিছু থান, যেগুলির ভিত ও তিন দিক পাকা হলেও তাতে কোনো ছাদ দেওয়া হয়নি। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, এই লৌকিক দেবতা কোনো বদ্ধতার মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন না। এই লৌকিক দেবতা উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রাকৃতিকভাবে থাকতে পছন্দ করেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, জয়নগরের কয়াল পাড়া ও রক্তাখাঁ পাড়ায় পঞ্চানন্দের থানগুলি এখনও একইভাবে আছে। রক্তাখাঁ পাড়ার পঞ্চানন্দ যদিও পাকা থানে আছেন। থানটি আদি গঙ্গার পাড়েই অবস্থিত। থানের ভিতরে বেশ খানিক গর্তের ভিতর পঞ্চানন্দ বিরাজ করেন। আবার পাল পাড়ায় দেখা যায় যে, একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছের নীচে পঞ্চাননের থান। তেঁতুল গাছটিকে বেদীর মত করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষদের থেকে শোনা যায় যে, তারা একবার এই থানটিকে পাকা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পঞ্চানন্দ তাদের আদেশ দেন যেন তাকে আবদ্ধ না করা হয়। কেননা তিনি খোলা আকাশের নীচে থাকতে পছন্দ করেন। আবার বেশ কিছু পঞ্চানন্দের থান পর্ণকুটিরের মতো। কাশিনগরে মাইবিবির হাট বিবিমার নাম থেকে হয়েছে। এই হাটেই পঞ্চানন্দের থান আছে। এখানে তিনি বেশ রাজকীয়ভাবেই বিরাজ করেন। এছাড়া পঞ্চানন্দ যে থানে থাকেন সেখানে অন্য দেবদেবী থাকলেও তিনি প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হন। পঞ্চানন্দের থানগুলি সাধারণত কোনো প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় থাকতে দেখা যায় আর সেই কারণে এই গাছের কেউ ক্ষতি করে না। গ্রামের মানুষ বট ও অশ্বত্থের বিয়ে দিয়ে রোপন করে। এবং এইসব বৃক্ষের নিচে সাধারণত পঞ্চানন্দের থান থাকে।

এই অধ্যায়ের একেবারে শেষে দক্ষিণবঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরির ইতিহাসকে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে জল-জঙ্গল ঘেরা মানুষের জীবন-জীবিকার কারণে দেবদেবীর থান তৈরি হয়েছে। তাছাড়া জঙ্গলকাটির থান বলার প্রসঙ্গে এই থানের উৎপত্তির ইতিহাস দেখা হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরিতে বাংলার জমিদার, মুসলমান শাসক থেকে শুরু করে লোকায়ত মানুষের নানা আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভাবনা কীভাবে কাজ করেছে তা আলোচিত হয়েছ।

গবেষণার ***তৃতীয় অধ্যায়ে*** ক্ষেত্রসমীক্ষার পদ্ধতি, সমীক্ষা ও প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষেত্রের সঙ্গে সমীক্ষকের সম্পর্কের নানা স্তর এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতির গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার গুরুত্বের দিক সবার আগে আলোচিত হয়েছে। লোকায়ত সমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতি বুঝতে গেলে ক্ষেত্রসমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। 'লোক'-এর সামগ্রিক পরিচয় ও তাদের পালিত সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে কোনো বিদ্যায়তনিক পরিসরে সম্ভব নয়। বিদ্যায়তনিক পরিসরে লোকসংস্কৃতিচর্চা বা বোঝাপড়া যেন জল ছাড়া মাছের মতো। লোকসংস্কৃতি বোঝার জন্য তত্ত্ব যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমন করেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে লোকায়ত সমাজ থেকে পাওয়া তথ্য। লোকসংস্কৃতি পাঠ বা বোঝাপড়া সম্পূর্ণ তখনই হয় যখন ক্ষেত্র থেকে পাওয়া তথ্যের উপর তত্ত্বের আলো পড়ে তাত্ত্বিক আকার ধারণ করে। আবার ক্ষেত্র থেকে পাওয়া তথ্য নতুন কোনো তত্ত্বের দিক-নির্দেশ করতে পারে। এই দ্বিমুখী জ্ঞান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই লোকসংস্কৃতি চর্চা সফল হতে পারে। লোকায়ত মন ও তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বুঝতে গেলে এই গ্রামীণ, কৌম্য সমাজের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হয়। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলে প্রতিদিন কিছু না কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। দক্ষিণবঙ্গে বারো মাসে তেরো পার্বণ এই লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এই সমস্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করে মানুষের মুখে মুখে অজস্র মৌখিক আখ্যান প্রচলিত আছে। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে এই আচার-অনুষ্ঠান ও মৌখিক আখ্যান একমাত্র লোকায়ত মানুষের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়। ফলে এই গবেষণা ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়।

এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল নির্বাচনের কারণ আলোচিত হয়েছে। যে কোনো বিদ্যায়তনিক পরিসরে ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল নির্বাচন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। বাংলার সব অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে গবেষণা করা এক প্রকার অসম্ভব। এই গবেষণার নির্বাচিত অঞ্চল হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিছু অংশ। আসলে এই গবেষণার জন্য এমন একটি ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয় যেখানে আদিম সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র আছে। মানুষের পরিবেশপাঠ বা পরিবেশভাবনা নিয়ে সময় ও স্থানের নিরিখে পাঠ করা খুবই জরুরি। গবেষণার এইসব বিষয়ের দিক থেকে আদিগঙ্গা বরাবর অঞ্চল উপযুক্ত ক্ষেত্র। নাগরিক পরিসরে বাস করে মানুষ তার ঐতিহ্যকে ভুলে যায়; নগরের সঙ্গে তাই প্রকৃতির পারস্পরিক সহাবস্থানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আবার নগর থেকে দূরে থাকা লোকায়ত সমাজ ঐতিহ্যকে বহুলাংশে লালন করে। আদিগঙ্গার সঙ্গে বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস যুক্ত আছে এবং আদিগঙ্গার সঙ্গে নিম্নগাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের ধর্মীয় ভাবাবেগ যুক্ত হয়ে একটি গবেষণার পরিসর তৈরি করে। এই আদিগঙ্গার গতিপথের সঙ্গে যুক্ত অঞ্চলের নানা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয় মঙ্গলকাব্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণরামের *রায়মঙ্গল*-এ এই নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। চৈতন্যদেব নীলাচলে যান এই আদিগঙ্গার পথ ধরে। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* (১৫৩৫ খ্রি) থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের যাত্রাকালে আদিগঙ্গার তীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ও লৌকিক দেবদেবী থেকে শুরু করে শিবকেন্দ্রিক পূজাচার, এই এলাকাগুলির ধর্মীয় মাহাত্ম্য তৈরি করেছে। এর সঙ্গে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। এই সমস্ত অঞ্চল আগে জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। জল ও জঙ্গল ছিল মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান পথ। এই অঞ্চলে জেলে, বাগদি, প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষ বসবাস করে এবং এরা মূলত জল-জঙ্গলের ওপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করে। আদিগঙ্গার প্রবাহ ধরে চৈতন্যদেবের যাত্রা ও নানা ঘাটে রাত্রিযাপনের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত এলাকার কৌলিন্য বৃদ্ধি হয়েছে । আবার দক্ষিণবঙ্গের এই সমস্ত এলাকায় ব্রাহ্মণ বসতি হয়েছে গুপ্তযুগ থেকে। গুপ্তযুগে ভূমিদান সূত্রে বহু ব্রাহ্মণ এই সমস্ত অঞ্চলে এসে বসতি করে। এছাড়া দক্ষিণী ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশদের আগমন সেন আমলে বৃদ্ধি পায়। এইসমস্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের আগমন সব থেকে বেশি বৃদ্ধি পায় মুসলমান শাসনকালে। বহু ব্রাহ্মণ নিজেদের মান-সম্মান বজায় রাখতে এই নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে

চলে আসে। এরপরে ইংরেজ শাসনকালে জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে রাঁচী, ছত্রিশগড়, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি এলাকা থেকে আদিবাসী অর্থাৎ কোল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি জনজাতি নানা সুবিধার জন্য এই সমস্ত অঞ্চলে আসে তাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে। মেদেনীপুর ও উড়িষ্যা থেকে নানা বর্ণের মানুষ এই নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য আসে। সবশেষে পূর্ববঙ্গ থেকে বহু মানুষ সুস্থ জীবনযাপনের প্রত্যাশায় বসতি স্থাপন করে। ফলে আদিগঙ্গার দুই তীরবর্তী অঞ্চলে মিশ্র-সংস্কৃতির পরিসর দেখ যায় । এছাড়া এখানে নিম্নবর্ণের মানুষের পালিত সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে তার বিরোধ-সমন্বয় অঞ্চলের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে গঙ্গারিডি সভ্যতার সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য। আদিগঙ্গা প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসে গঙ্গারিডি সভ্যতার কথা। বর্তমানে আদিগঙ্গার দুই পাশের জনবসতি সেই গঙ্গারিডি সভ্যতার ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছে। সব মিলিয়ে আদিগঙ্গার দুই পাড়ের অঞ্চল ও লোকায়ত সমাজ-সংস্কৃতি বিস্তৃত গবেষণার পরিসর তৈরি করে। গবেষণায় আদিগঙ্গার দুই পাড়ের অঞ্চল ও নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল সব দিক থেকে উপযুক্ত বলে নির্বাচিত করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রের সঙ্গে সমীক্ষকের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এখানে একজন ক্ষেত্রসমীক্ষক কীভাবে ক্ষেত্র থেকে তথ্য অহরণ করবে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর প্রাক-ক্ষেত্রসমীক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণায় প্রাক-ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পর্বেই ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতিপর্ব সেরে নিতে হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য কোন অঞ্চলে যাওয়া হবে থেকে শুরু করে, ক্ষেত্রসমীক্ষার মূল প্রবণতা, কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, তার বিশদ পরিকল্পনা এই প্রাক-ক্ষেত্রসমীক্ষা পর্বেই তৈরি করা হয়। প্রাক-ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে ‘পাইলট সার্ভে’ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ নিরন্তর প্রক্রিয়া হতে পারে না। বিশেষত, কোনো বিদ্যায়তনিক পরিসরে গবেষণা করলে ক্ষেত্রসমীক্ষার ধরণ, সময় ও অর্থের নিরিখে ঠিক করা উচিত। এইজন্য কোনো ক্ষেত্রসমীক্ষাকেন্দ্রিক গবেষণায় ‘পাইলট সার্ভে’ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই ‘পাইলট সার্ভে’র মাধ্যমে কোনো এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান বা অঞ্চল সম্পর্কে জানা যায়। এই ‘পাইলট সার্ভে’র পরে আলোচিত হয়েছে মূল ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাওয়ার আগে কোন কোন বিষয় সমীক্ষককে মাথায় রাখতে হয় বা একজন

সমীক্ষক ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে কোন কোন জিনিস সঙ্গে নিতে হয়। এরপর এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষেত্র থেকে নানা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তার মধ্যে দু'টি পদ্ধতি হল- 'নিয়মনিষ্ঠ পদ্ধতি' (formal method) এবং 'ঘরোয়া পদ্ধতি' (informal method)। এই নিয়মনিষ্ঠ পদ্ধতিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি নির্দিষ্ট ছক মেনেই হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রসমীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র থাকে তার ভিত্তিতে উত্তর তথ্যদাতাদের থেকে নেওয়া হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় ঘরোয়া পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিতে রাস্তার চায়ের দোকান বা কোনো থানের কাছে তাস খেলার জায়গায় মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তা একেবারেই খাঁটি । চলতে চলতে, চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে মানুষদের কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, সেই তথ্যে নানা দিক প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত তথ্য জীবন্ত, কার্যত কথা বলে। আসলে ক্ষেত্রসমীক্ষা যখনই কোনো নির্দিষ্ট ছক নির্ভর হয় তাতে বৈচিত্র থাকে না। ফলে ক্ষেত্রসমীক্ষাতে নির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া তার মধ্যে অন্য কিছু পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ঘরোয়া পদ্ধতি তখনই কার্যকরী হয়ে উঠবে যখন কোনো সমীক্ষক নিজের আমিত্বকে জাহির না করে ঐ সমস্ত মানুষদের একজন হয়ে উঠবেন। সমীক্ষক নিজের শিক্ষার অহংবোধ দিয়ে যদি দূরত্ব তৈরি করে রাখে তাহলে লোকায়ত মানুষদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

লোকসংস্কৃতি গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষার নানা পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। এই পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হল, ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ। এখানে একজন সমীক্ষক কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে বিশদে তথ্য সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহ পদ্ধতিকে বলে 'সামনা-সামনি' পদ্ধতি। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের আর একটি পদ্ধতি হল দলগতভাবে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি। অর্থাৎ, তথ্যদাতারা দলগতভাবে এক জায়গায় জড় হবেন, সমীক্ষক তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন বা কোনো অনুষ্ঠানের সময় সমীক্ষক সেখানে গিয়ে সরাসরি ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন। যদিও সমীক্ষক নিজের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই দুই পদ্ধতি একসঙ্গে প্রয়োগ করতে পারেন। কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি সম্পর্কে সমীক্ষকের জ্ঞান বা জানাশোনা নানা ভাবে হতে পারে। তার মধ্যে বিশেষত লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে, যেখানে ক্ষেত্রসমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সেখানে এই বোঝাপড়া সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে— 'পূর্বজ্ঞান পদ্ধতি' (prior knowledge) ও 'তাৎক্ষণিক জ্ঞান পদ্ধতি'র (instant

knowledge)- মাধ্যমে। ক্ষেত্রসমীক্ষার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগে থেকেই ওই এলাকা বা সেখান থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার হাল-হকিকত জেনে ক্ষেত্রসমীক্ষা করাকে পূর্বজ্ঞান পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে নানা বই ও পত্র-পত্রিকা পড়ে সেই এলাকার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা নিয়ে একজন সমীক্ষক ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। আবার সমীক্ষক তার সমীক্ষিত অঞ্চল সম্পর্কে কোনো পূর্বজ্ঞান ছাড়াই ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ক্ষেত্রে গিয়ে সরাসরি এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে সেই এলাকার বিশদে জ্ঞান লাভ করে। এই যে পূর্ব জ্ঞান ছাড়াই কোনো এলাকার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে জানাকে তাৎক্ষণিক জ্ঞান আহরণ পদ্ধতি বলা হয়। কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রসমীক্ষা পদ্ধতিতে বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এতে অনেক বেশি সময় যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাদের থেকে তথ্য পাওয়া যায় তাদের ক্ষেত্রবন্ধু বলা হয়। এইসমস্ত পদ্ধতির মধ্যে আমার গবেষণায় নির্বাচিত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষে ক্ষেত্রসমীক্ষার কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে একজন ক্ষেত্রসমীক্ষকের কীভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা উচিৎ, কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে ক্ষেত্রে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে তা বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার **চতুর্থ** অধ্যায় গবেষণার প্রধান অংশ। এই অধ্যায়ে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতেই লোককথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা লৌকিক দেবদেবীর সাহিত্য লোককথার মধ্যে পড়ে। ফলে লোককথা সম্পর্কে বিশদে জানা জরুরি। লোককথার কবে জন্ম হয়েছে তার ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়। সেই প্রাচীন কাল থেকে, ইতিহাসের কোন অন্ধকারময় সময় থেকে মানুষ গল্প বলতে ও শুনতে ভালোবাসত। আর এই গল্প বলা ও শোনা থেকেই লোককথার জন্ম হয়েছে বলে মনে করা হয়। লোককথায় একইসঙ্গে স্থানীয় ও সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য ধরা থাকে। লোককথায় যেমন স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখে তার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখে বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে তেমন করে লোককথার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতীয় বা নির্বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে দেখা যায়। যেখান থেকে একটি লোককথার সঙ্গে নানা দেশের লোককথার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একটি লোককথায় প্রত্নপ্রতিমা বা আর্কেটাইপগত বৈশিষ্ট্য আছে, যেখান থেকে লোককথার মূল বা অটুট বিষয়ের সন্ধান করতে পারা যায়। আমরা জানি লোককথার মধ্যে এই প্রত্নপ্রতিমাগত বৈশিষ্ট্য সমাজ-সভ্যতার নানা পরিবর্তনের

মধ্যে নিজেকে অপরিবর্তিত রাখে। এই প্রত্নপ্রতিমার হাত ধরেই বিভিন্ন দেশের লোককথার মধ্যে মিল পাওয়া যায়। লোককথার মধ্যে লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের নানা সমস্যা, নানা চাহিদার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই হিসেবে লোককথাকে জাতীয় সাহিত্য বলা যেতে পারে। লোককথার সঙ্গে স্মৃতি ও শ্রুতির সম্পর্ক নিবিড়ভাবে যুক্ত। লোককথা যেহেতু মুখে মুখে বংশ-পরম্পরায় প্রবাহিত হয় তাই এখানে লোককথার আশ্রয়স্থল হিসেবে স্মৃতির ভূমিকা প্রধান। লোককথার কথক, যিনি গল্প বলেন, স্মৃতি তার প্রধান অবলম্বন। কথকের গল্পটি বলবার সময়ে শ্রোতার মনে গল্পটিকে বা আখ্যানকে ছবির মতো করে শ্রোতার চোখের সামনে ভাসিয়ে দিতে হবে; না হলে কথক শ্রোতাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। ফলে লোককথার মধ্যে স্মৃতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন করে শ্রুতি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লোককথায় ধর্মের সম্পর্ক গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু লোককথার মধ্যে ধর্মীয় অনুষঙ্গ প্রবেশ করলে এর মূল সজীবতা হারিয়ে যায়। আমরা জানি যে, লোকায়ত সমাজে লোককথাগুলি সৃষ্টিতে ধর্মীয় প্রভাব খুব বেশী কার্যকরী নয়। লোককথার মধ্যে যে নীতির প্রচার দেখা যায় তা মানুষ ও তার সমাজকে ধরে রাখার জন্য। কিন্ত এই প্রচার যদি একান্তই ধর্মের প্রয়োজনে হয়ে থাকে তাহলে তা লোককথাই থাকে না। আমরা জানি যে বুদ্ধজাতক প্রথম পর্বে যে নীতির প্রচার করেছিল তা লোককথার আশ্রয়ে কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই জাতকগুলি একেবারেই বৌদ্ধধর্মের প্রচারক হয়ে পড়ে; এর ফলে লোককথাগুলি তার সজীবতা হারিয়ে ফেলে। বাংলার লোককথা ধর্মীয় প্রভাব দ্বারা সর্বদা চালিত হয়নি। মৌখিক আখ্যানগুলির মধ্যে ধর্মীয় অনুষঙ্গ এলেও তাতে কখনোই ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রবেশ করেনি। আর এইজন্য বাংলার এই সমস্ত লোককথা তার সজীবতা ও আকর্ষণকে আজও বজায় রেখেছে। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক লোককথার মধ্যে দেবদেবীর কথা থাকলেও তাতে লোকায়ত ধর্মই প্রধান বিষয় হয়ে ওঠেনি বা ধর্ম প্রচার এই সমস্ত লোককথার মূল বিষয় হয়ে ওঠেনি। বাংলার লোককথা নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য বা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি। বাংলার গ্রামীন সমাজ নিজেদের নানা হাসি-কান্না বুনে চলেছে এই সমস্ত লোককথার মধ্যে। কিন্তু আমরা জানি যে বাঙালির জাতীয় চরিত্রের মধ্যে ধর্মের প্রভাব সব সময় কাজ করেছে। ফলে লোককথার মধ্যেও ধর্মের অনুপ্রবেশ স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশ করেছে। এই লোককথার আলোচনা প্রসঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র আলোচনা

করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে অতিবাহিত করতে হয়। এই নির্ভরতা থেকেই প্রতিটি দেবদেবীকে কেন্দ্র করে নানা কাহিনি তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত আখ্যান এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ভয়, ভক্তি ও অলৌকিকতার মোড়কে প্রবাহিত হয়। লোকায়ত সমাজের এই সমস্ত আখ্যান কেবলমাত্র স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে না। এই সমস্ত আখ্যান গ্রাম-অঞ্চলের বেড়া টপকে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে যে দেবদেবী নিয়ে আখ্যানটি তৈরি হয়েছে সেই দেবদেবীর মাহাত্ম্যের উপর নির্ভর করে। তিনি যতটা জাগ্রত হয়ে লোকায়ত মানুষের মনে বিরাজ করবেন সেই দেবদেবী নিয়ে অসংখ্য মৌখিক আখ্যান তৈরি হয়। বাংলার বহু থান ও দেবদেবী এই মৌখিক আখ্যানের মধ্য দিয়ে আজও সমানভাবে পূজিত হয়ে আসছেন। কেননা, ওই দেবদেবীর মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক আখ্যান বিভিন্ন এলাকার মানুষ শুনে দেবদেবীর কৃপা ভিক্ষা করতে সেই নির্দিষ্ট থানে উপস্থিত হয়। এর ফলে সেই দেবদেবীর থান শক্ত ভিত পায় ও ভক্ত সমাগমের ফলে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলার দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে মৌখিক আখ্যান প্রচলিত তা নানা বিষয়ের সমবায়ে প্রচারিত বা প্রচলিত। এই সমস্ত আখ্যানে কেবলমাত্র দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয় না। আমরা যদি এই সমস্ত আখ্যানের থেকে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক ছদ্ম আড়ালকে সরিয়ে রাখি তাহলে এই সমস্ত আখ্যানের মধ্যে বাংলার সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও মানুষের প্রতিদিনের যাপনচিত্রকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক এই সমস্ত আখ্যানে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনা গভীরভাবে প্রকাশিত হয়।

দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর যে সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে মৌখিক আখ্যান গড়ে উঠেছে তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশের প্রথমে থান উৎপত্তি নিয়ে যে সমস্ত আখ্যান গড়ে উঠেছে তার বিশদে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থান ও তার উৎপত্তি নিয়ে নানা রকমের আখ্যান প্রচলিত আছে। লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরি হওয়া নিয়ে যে সমস্ত আখ্যান প্রচলিত আছে তাতে থান তৈরি হওয়ার কারণগুলি হল—

১) কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির দ্বারা থান তৈরি ও পূজার প্রচলন।

২) দক্ষিণবঙ্গে কোনো দেবদেবীর স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে বহু থান তৈরি হয়েছে।

৩) লোকায়ত মানুষের কোনো কিছু প্রাপ্তি ও সেই পাওয়াতে দৈব অনুগ্রহ আছে বলে ধরে নেওয়া। এরপর সেই ব্যক্তির দ্বারা থান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দৈব-সহায়তায় রক্ষা পাওয়া ও থানের নির্মাণ।

৫) পতিত জমি বা বনজঙ্গলের মধ্যে থেকে কোনো পাথর বা শিলাখণ্ড পাওয়া ও তাকে দেবতা মনে করে সেখানেই থান তৈরি হয়। জঙ্গল কাটার সময় থান তৈরি হলে তাকে জঙ্গলকাটির থান বলে।

৬) মানুষের সন্তান লাভের আশায় দেবদেবীর কাছে মানত করে। এই সন্তান লাভের ফলে ওই ব্যক্তি থান তৈরি করে। এই সন্তান লাভ ও থান তৈরি নিয়ে লোকায়ত সমাজে অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে।

৭) বাংলায় শিবের থান তৈরি হওয়ার পিছনে অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনি হল যে, কোনো দুগ্ধবতী গাভী মানুষকে দুধ না দিয়ে কোনো পরিত্যক্ত মাঠের নিদির্ষ্ট জায়গায় নিজে থেকেই দুধ দেয়। পরে মানুষ জানতে পারে সেখানে শিবলিঙ্গ আছে। মানুষ সেই শিবলিঙ্গকে তুলে সেখানেই লোকায়ত শিবের থান তৈরি করে।

৮) জমির শস্য পাহারা দেওয়ার জন্য ক্ষেতের কাছাকাছি নির্দিষ্ট দেবতার থান তৈরি করা হয়। এবং এই থানকে নিয়ে বহু আখ্যান প্রচলিত আছে।

৯) লোকায়ত সমাজে বিভিন্ন রোগ থেকে দেবদেবীর ঔষধ খেয়ে সুস্থ হয়। গ্রামের মানুষ এই দৈব অনুগ্রহে শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরে লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরি করে।

১০) জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবী। লোকায়ত মানুষের জীবিকার অনেকাংশে নির্ভর করে এই সমস্ত দেবদেবীর উপর। লোকায়ত সমাজ তাদের জীবিকার জন্য থান তৈরি করে।

আবার লৌকিক দেবদেবীর বিগ্রহকে কেন্দ্র করে অসংখ্য আখ্যান তৈরি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের আদিগঙ্গার দুই পাড় বরাবর যে সমস্ত থান পাওয়া যায় তার কোনো কোনো থানে দেবদেবীর বিগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো থানে দেবদেবীর মূর্তি নেই। এই মূর্তিবিহীন থানে পাথরের বিগ্রহ থাকে এবং লোকায়ত মানুষ সেই পাথরকেই পুজো করে। এছাড়া থানে মাটির ঢিবি, পাথর থেকে শুরু করে গাছকে লোকায়ত মানুষ নিদির্ষ্ট দেবদেবী মনে করে পুজো করে। এই সমস্ত বিগ্রহ,

মূর্তির উত্থান ও তার প্রতিষ্ঠা নিয়ে বাংলার লোকসমাজে প্রচুর আখ্যান প্রচলিত আছে। আমরা আগেই বলেছি যে, লৌকিক দেবদেবীকে মানুষ ভয়মিশ্রিত ভক্তিভরে পুজো করে। এই দেবদেবীর পুজো নিয়ে অসংখ্য আখ্যন লোকায়ত সমাজে প্রচলিত আছে। এই সমস্ত আখ্যানে যে বিষয়গুলি থাকে তাহল—

১) পূজায় বলিদান বন্ধ হওয়া নিয়ে আখ্যান তৈরি হয়।

২) পূজা নিয়ে প্রচলিত আখ্যানে আমরা দেখতে পাই পূজার দিনে বা পূজার নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ফুল ফোটে। লৌকিক দেবদেবীর থানে এমন ঘটনা ঐতিহ্য-পরম্পরায় ঘটে আসছে। এই ফুল ফোটার মধ্য দিয়ে দেবদেবী পূজা শুরুর সংকেত পাঠায় বলে লোকায়ত মানুষ বিশ্বাস করে। এই বিষয় নিয়ে দক্ষিণবঙ্গে বহু অখ্যান প্রচলিত আছে।

৩) পুজোর দিনে ফুল ফোটার মতো কোনো নিদির্ষ্ট প্রাণী বা পাথরের আবির্ভাব হয়। এই নিয়ে বহু আখ্যান তৈরি হয়েছে।

৪) পুজোর দায়িত্বে কোন পুরোহিত থাকবেন বা থানের সেবায়ত কে হবেন সেই নিয়ে বিবাদ ও সমাধান নিয়ে আখ্যান গড়ে উঠেছে।

৫) পুজোর সময়ে ত্রুটির ফলে অলৌকিক ঘটনা ঘটে ও সেই নিয়ে আখ্যান তৈরি হয়।

লোকায়ত সমাজে লৌকিক দেবদেবীর পুজো নিয়ে আখ্যানের বিষয় মোটের উপর এমনই হয়ে থাকে। এছাড়া দেবদেবীর কোপ ও কৃপা নিয়ে বহু আখ্যান লোকায়ত সমাজে প্রচলিত আছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আখ্যান গড়ে উঠেছে তারমধ্যে নানা বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায়।

এই গবেষণাপত্রের মূল জিজ্ঞাসা হল পরিবেশবাদী সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে তৈরি হওয়া আখ্যানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। ফলে চতুর্থ অধ্যায়ে এই পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের জন্ম, উদ্ভব ও এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সাহিত্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মাধ্যমে সাহিত্য ও পরিবেশকে পাঠ করার পরিসর তৈরি হয়। সাহিত্য সমালোচনার এই ধারাটি বিংশ শতাব্দীতে সুত্রপাত হলেও এই ধারা অল্প সময়ে খুবই জনপ্রিয় সাহিত্য সমালোচনার ধারা হয়ে ওঠে। পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত

১৯৭০-৮০-এর দশক থেকে শুরু হলেও এই সাহিত্যতত্ত্ব জনপ্রিয় ও সর্বস্তরে স্বীকৃত হয় ১৯৯০ সাল নাগাদ। পাশ্চাত্যের কিছু গবেষক ও অধ্যাপক সাহিত্যে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। বিদ্যায়তনিক পরিসরে অধ্যাপক ও গবেষক নানা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মধ্য দিয়ে এই ধারাটিকে সবার সামনে হাজির করেন। অধ্যাপক গলফেল্টি এই বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি বিদ্যায়তনিক পরিসরে এই সাহিত্যতত্ত্বটি চিন্তাভাবনা ও প্রসার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গলফেল্টি ১৯৯০ সালে রেনোর ইউনিভার্সিটি অফ নভোদাতে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। গল্টফেল্টির এই পদটির নাম ছিল—'Professor of literature and the environment'। ফলে আমরা বুঝতে পারি এই পদটির মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য ও পরিবেশ পাঠের ধরণ বা সাহিত্য ও পরিবেশের সম্পর্ককে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। সাহিত্য ও পরিবেশের সম্পর্কের খতিয়ানকে বোঝানোর জন্য গলফেল্টি ও ফর্ম (Fromm)-এর সম্পাদনায় *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology* (1996) নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, যা পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব পাকা ভিতের উপর স্থাপন করেন। এই সময়ে আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যা এই সাহিত্যতত্ত্বটিকে আরও বিস্তৃতি দান করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ইকোক্রিটিসিজিম কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ইউলিয়াম রুকার্ট তাঁর *Literature and Ecology: An Experimental in Ecocriticism* গ্রন্থে। এই সময়েই গ্লেন লভ (Glen Love) প্রকাশ করেন *American Nature Writing: New Contexts, New Approches।* এই দুইটি বই প্রকাশের ফলে সাহিত্যে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা প্রসারিত হতে দেখা যায়। এই বছরেই স্থাপিত হয় *ASLE* (Association for the Study of Literature and Environment)। এই সংস্থাটির প্রথম সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন স্কট স্লভিক (Scott Slovic)। এই সংস্থাটির প্রধান কাজ ছিল সাহিত্যকে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার ক্ষেত্র তৈরি করা (redrew)। এই শাখটি খুব শীঘ্র বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংস্থাটি মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে নতুন করে তুলে ধরে। এছাড়াও প্রকৃতিকেন্দ্রিক লেখাকে এই সংস্থার মধ্য দিয়ে সবার সামনে প্রকাশ করা হয়। এই সংস্থাটি যখন প্রথম শুরু হয় তখন সদস্য ছিল মাত্র তিরিশ জন কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে সাতশোর কাছাকাছি। ফলে বোঝা যায় এই সাহিত্য শাখাটির জনপ্রিয়তার ধরনকে। ASLE প্রত্যেক বছরে দুইবার করে *ASLE News*

এবং *ISLE* (Inter Disciplanry Studies in Literature and Environment) নামে পত্রিকা প্রকাশ করেণ। *ASLE*-এর প্রত্রিকা প্রকাশ ও কাজের মৌলিক উদ্দেশ্যই হল সারা পৃথিবীতে পরিবশ-সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও এই সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও গবেষণাপত্র প্রকাশ করা। এই সংস্থা পরিবেশ ও মানুষের পালিত সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ককে দেখার চেষ্টা করে। *ISLE* নামে পত্রিকাটি পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনার ধারাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্যকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখার সূত্রপাত হয়। এছাড়াও এই পত্রিকার মাধ্যেমে সাহিত্য ও পারফর্মিং আর্টের সম্পর্ককে পরিবেশ ভাবনার নিরিখে পাঠ করা হয়। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব প্রথম দিকে খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরে বিরাজ করে। এই পর্বে প্রকৃতিকেন্দ্রিক লেখাকেই গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভয়াবহ বিপন্নতার জন্য মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। পরিবেশ বিপন্নতার জন্যই পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের পরিধী আরও বিস্তৃত আকার ধারণ করে। পরিবেশবাদী সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্বকে আমরা এই সময়ের থেকেই 'আন্তঃবিদ্যা' এই তকমা দিতে পারি। কেননা, এই সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বটি তার বিশাল পরিধীতে নানা বিষয়ের আন্তঃসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পরিবেশবাদী সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্বটির পরিধী এতই বিস্তৃত যে কোনো একটি সংজ্ঞায় এর সম্যক ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে খুব সহজ করে বুঝতে গেলে বলতে হয়, সাহিত্য ও আমাদের চারপাশের যে ভৌত পরিবেশ তার মধ্যেকার সম্পর্ককে পাঠ করার একটি তাত্ত্বিক অবস্থান। আমরা যেমন নানা তত্ত্ব দিয়ে সাহিত্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করি। যেমন নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বে আমরা দেখতে পাই লিঙ্গ-রাজনীতির দ্বারা সাহিত্যকে পাঠ করা হচ্ছে। আবার মার্ক্সীয় সাহিত্য-বীক্ষায় দেখা হয় উৎপাদনের পদ্ধতি ও ধরনের জন্য নতুন নতুন শ্রেণির দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয় প্রভৃতি বিষয়গুলি সাহিত্যে কীভাবে বর্ণিত হচ্ছে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে সাহিত্যকে পৃথিবীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। এই সাহিত্যতত্ত্বে দেখা হয় একটি কবিতা বা সনেটে প্রকৃতি কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে; একটি উপন্যাসের কাঠামোয় বা প্লটে প্রকৃতি কীভাবে ভুমিকা পালন করছে। এছাড়া লেখক কোন মূল্যবোধের দ্বারা চালিত হয়ে উপন্যাসে বা সাহিত্যে প্রকৃতিকে বর্ণনা করছেন সেটাও এই তত্ত্বে দেখা হয়। লেখক যখন কোনো সাহিত্য রচনা করছেন তখন সেই সাহিত্যে

প্রকৃতিকে নিয়ে কোন ইচ্ছে প্রকাশ করছেন বা পরিবশের সজ্জা কেমন হবে তার কোনো দিশা তিনি দিচ্ছেন কিনা তা দেখা হয়। আমরা জানি যে, প্রকৃতিকে দেখা ও তাকে বোঝার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি সমান নয়। এই সাহিত্যতত্ত্ব প্রকৃতিকে নারী ও পুরুষ কীভাবে দেখছে তা বুঝতে চায় এবং যদি এদের দেখার মধ্যে কোনো ভিন্নতা থাকে তাহলে সেই ভিন্নতার কারণ কী? এই তাত্ত্বিক পরিসরটি বুঝতে চায় মানুষের বন্যতা সম্পর্কিত ধারণার স্বরূপ। এই সাহিত্যতত্ত্ব দেখতে চায় আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা-ভাবনায় ও কাজকর্মে প্রকৃতি কীভাবে ধরা পড়ছে? পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব আমাদের প্রকৃতি পাঠের ঐতিহ্য বা তার ইতিহাসকে বুঝতে চায়। আমাদের চারপাশের পরিবেশ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পরিবেশের এই পরিবর্তনের কারণ এই সাহিত্যতত্ত্ব বুঝতে চায়। বর্তমানে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, এই দুই পরিসরকে এমন করে ভাবা হয় যেকোনো একটি মাত্রাতিরিক্ত বাড়লে অপরটির সমূলে ক্ষতি হবে অর্থাৎ মানুষের সংস্কৃতির প্রসার হলে প্রকৃতির বিস্তার কমবে ও পরিবেশের ক্ষতি হবে। ফলে মানুষের পালিত সংস্কৃতি ও প্রকৃতির বিপরীত অবস্থান দেখা যায়। কিন্তু পরিবেশ সাহিত্যতত্ত্বে এই দুইয়ের কোনো বিরোধ মানা হয় না। এই সাহিত্যতত্ত্ব মানুষের পালিত সংস্কৃতিকেই পরিবেশ রক্ষার মূলসূত্র হিসেবে ধরা হয়। এখানে বলা হয় প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে বিভেদ করে কোনভাবেই প্রকৃতিকে রক্ষা করা যাবে না বরং প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হলে মানুষের সংস্কৃতিকে প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল করে পালন করতে হবে। আসলে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব মানুষের চিরায়ত সংস্কৃতিতে প্রকৃতি-পূজার প্রচলন ছিল সেই ইতিহাসকে সামনে আনে। আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের সংস্কৃতিতে প্রকৃতি রক্ষার মানসিকতা ছিল যা আজকের পরবর্তিত সমাজ কাঠামোয় মানুষ প্রকৃতিকে, সংস্কৃতির বিরোধী করছে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য। নারীবাদী দার্শনিক ভ্যাল প্লামউড প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বিরোধ প্রসঙ্গে বলেন যে, পাশ্চাত্যে এই ধারণা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন পাশ্চাত্যে প্রকৃতিকে মানুষ তার সংস্কৃতির অপর হিসেবে দেখেছে। আমরা জানি এই ধারণা প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের এই দ্বিত্ববাদী ধারণা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো থেকে দেকার্ত পর্যন্ত প্রসারিত ও প্রচার লাভ করেছে। এই দ্বিত্বের ধারণার ফলে প্রকৃতি ও মানুষের পালিত সংস্কৃতির মধ্যে কোথাও সমতার কথা বলা থাকে না; এরফলে একে অপরের উপর আধিপত্যের ধারণাই ক্রিয়াশীল থাকে। আমরা জানি যে, খ্রিষ্টীয় ধারণায় মানুষ প্রকৃতির উপর

আধিপত্য বিস্তার করে এবং নিজেকে সব কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। বিশ শতকে আমেরিকায় জন মুইর (১৮৩৮-১৯১৪) এই ধারণা থেকে সরে এসে 'অধিবিদ্যক'-চেতনায় প্রকৃতি যেভাবে ধরা দেয় সেই চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকৃতি সংরক্ষণের কথা বলেন। মুইর বহুমাত্রিক ঈশ্বরের কথা বলেন, যেখানে পরিবেশের সমস্ত কিছুতেই ঈশ্বরের অবস্থান ও প্রকাশ বিদ্যমান। ফলে পরিবেশের সমস্ত জৈব-অজৈব উপাদানকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করা মানুষের আধ্যাত্মিক কর্তব্য। এই ভাবনা থেকেই তিনি 'সিয়েরা ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন যা আমেরিকায় পরিবেশ সংরক্ষণে জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইকোক্রিটিসিজিম সাম্প্রতিক সময়ে মূলত চারটি পরিসরকে গুরুত্ব দেয়— নান্দনিক দিক, সামাজিক দিক, বৈজ্ঞানিক দিক ও সাংস্কৃতিক দিক। যদিও এই সাহিত্যতত্ত্ব কোনো একটি বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। মানুষের দর্শন-চিন্তা, তার পালিত ধর্ম-ভাবনা থেকে শুরু করে সাহিত্য-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর সমবায়ে বিস্তৃত হয়েছে। পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনার তত্ত্বটিকে আন্তঃবিদ্যার সমালোচনা তত্ত্ব হিসেবে দেখা হয়; যেখানে সাহিত্য, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম থেকে শুরু করে মানুষের পালিত সমস্ত কিছু ভীড় করে এর তত্ত্ববিশ্বে স্থান করে নিয়েছে।

এই অধ্যায়ের শেষে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব দিয়ে লৌকিক দেবদেবীর সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রকাশিত পরিবেশভাবনার স্বরূপকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এহাড়া দেবদেবীর থান, পুকুর ও বৃক্ষের অবস্থানের মাধ্যমে প্রকাশিত লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনাকে পাঠ করা হয়েছে। বাংলার লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আখ্যান প্রচলিত আছে তা নানা বিষয়ের সমবায়ে তৈরি হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি এই সমস্ত আখ্যানের মধ্যে লোকায়ত মানুষের মনের হদিশ পাওয়া যায়। এই আখ্যানগুলির আপাত সরলতা বা ছদ্ম আড়ালকে সরিয়ে দিলে বাংলার সামজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার সমাজ ইতিহাস নির্মাণে এই আখ্যানগুলি যেমন বিশ্বস্ত উপাদান, তেমনি এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে লোকায়ত সমাজের পরিবেশ ভাবনার ধরন-ধারণকে পাওয়া যায়। আমরা জানি লোকায়ত মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক আজন্ম কালের। লোকায়ত মানুষ তার যাপনচিত্রের মধ্যে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই লৌকিক দেবদেবীকে পূজাচার ও আখ্যানের মধ্যে মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশিত হয়। আমরা জানি এই লৌকিক দেবদেবী উর্বরতা শক্তির প্রতীক। লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক আখ্যানে এই উর্বরতাকেন্দ্রিক বহু কাহিনি পাওয়া

যায় যেখানে মানুষ তার সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির থেকে সহায়তা ভিক্ষা করছে এবং পরিবেশকে রক্ষা করার বিষয়ে সচেতনার প্রচার করছে। লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে লোকায়ত মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণের চিন্তাকে প্রকাশ করে চলেছে আবহমানকাল থেকে।

আমরা জানি লৌকিক দেবদেবীর থান রাস্তার ধারে, মাঠের পাশে বা ঝোপঝাড় থেকে শুরু করে গ্রামের মাঝে বা কোনো লোকালয়ের মধ্যে থাকে। থান মানুষের ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতি পালনের পরিসর। এই থানগুলির অবস্থানের জন্য থান ও তার আশপাশে কংক্রিটের জঙ্গল হতে দেখা যায় না। কেননা থানের জমিকে দেবত্তোর জমি বলা হয় ও তা নিষ্কর থাকে। আজকের সময়ে যখন সব দিকে ইঁটকাঠের ইমারত গড়ে উঠছে সেখানে এই সমস্ত থানগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাকা মন্দিরে পর্যবসিত হয় না। এবং এর চারপাশের সবুজকে উৎখাত করতে দেয় না। থানগুলি থাকার জন্য এর চারপাশের জীববৈচিত্র অটুট থাকে। ফলে এই থানের জন্য এই এলাকার বাস্তুতন্ত্র ঠিক থাকে। লৌকিক দেবদেবীর থানের চারপাশে অনেক বৃক্ষ দেখা যায় এবং এই বৃক্ষের সঙ্গে থানের নিকট সম্পর্ক। লোকায়ত মানুষ এই সমস্ত গাছে দেবত্ব আরোপ করে বা ওই গাছে দেবতার আশ্রয় আছে বলে কল্পনা করে ওই গাছের কোনো ক্ষতি করে না। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবীকেন্দ্রিক এমন অনেক আখ্যান পাওয়া যায় যেখানে দেবদেবী মানুষকে স্বপ্নাদেশ দিচ্ছেন যেন এই থানের গাছ কাটা না হয়। আমরা জানি যে থানের চারপাশে যে জমি বা থানকে মানুষ ব্যক্তিগত মালিকানা বলে মনে করে না। থান ওই গ্রামের বা অঞ্চলের সবার; তাই ওই অঞ্চল বা গ্রামের সবাই এই থান ও তার চারপাশের পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়। এই সাহিত্যতত্ত্ব কেবল সাহিত্য ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলে না, মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরিবেশ ভাবনা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে আলোচনা করা হয়। একইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের পালিত ধর্মীয় পরিসরে পরিবেশ রক্ষা সরাসরি প্রকাশিত না হলেও তার ধর্ম ভাবনায় পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি লুকিয়ে থাকে। দক্ষিণবঙ্গে বৃক্ষ ও তার তলায় লৌকিক দেবদেবীর আস্থানা প্রতিটি গ্রামে দেখা যায়। দেবদেবীকেন্দ্রিক আখ্যানে দেখা যায় যে, যে বৃক্ষের তলায় যে থানটি আছে সেই বৃক্ষ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে থানটিকে রক্ষা করে। আর সেজন্য দেবদেবীর স্পষ্ট নির্দেশ থাকে কোনোভাবেই সেই বৃক্ষকে যেন কাটা না হয়। এছাড়া আমরা

দেখতে পাই এই সমস্ত বৃক্ষে নানা প্রজাতির জীব বসবাস করে। লোকায়ত মানুষ মনে করে এই জীবের সঙ্গে থান ও দেবদেবীর গভীর সম্পর্ক আছে। লোকায়ত ভাবনায় সমস্ত জীব দৈব শক্তি যুক্ত এবং এরা মানুষকে নানাভাবে সহায়তা করে। ফলে এদের ভূমিকা পাহারাদারের মতো হয়। এদের ক্ষতি করতে গেলে মানুষের সমূহ বিপদ হয়। এরপর দেবদেবীর পুকুরের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনার স্বরূপকে আলোচনা কর হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি থানের পাশে পুকুর বা দিঘি থাকে। দেবদেবীর থানের পাশে এই পুকুর বা দিঘি থাকা অনিবার্য। লোকায়ত সমাজ এই থানের পাশে পুকুরকে দেবদেবীর পুকুর বলে থাকে। লোকায়ত সমাজ এই পুকুরের জলকে পবিত্র বলে মনে করে পান করে। ফলে মানুষ এই পুকুরের জলে নিত্যদিনের কাজ করে না। অর্থাৎ, এই পুকুরে মানুষ নোংরা ফেলে না, কাপড় পরিষ্কার করে না বা গবাদি পশুর স্নান করায় না। এর ফলে পুকুরের বাস্ততন্ত্র অটুট থাকে। মানুষ এই পুকুরে সাপ্তাহিক বা বাৎসরিক পুজোর দিনে স্নান করে, পবিত্র হয়ে থানে পুজো দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই পুকুরের জল দেবীর চরণামৃত করা হয় ও সেই জল পান করে মানুষ নানা রোগ থেকে মুক্তি পান। লোকায়ত সমাজে এই পুকুর নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে। তারা দেখেছেন যে এই পুকুরে দেবদেবী স্নান করেন। পুকুর নিয়ে এই সমস্ত আখ্যানে আমরা দেখতে পাই যে, এই পুকুরকে মানুষ সমানভাবে শ্রদ্ধা করে ও কেউ এই পুকুরকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ভাবে না। আজকের সময়ে যখন সমস্ত পুকুর বা জলাশয় ভর্তি করে মানুষ বসতি স্থাপন করছে এবং তারফলে পুরনো পুকুর আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আর এর ফলে পুকুরে বসবাসকারী নানা প্রজাতির অস্বিত্ব আজকের সময়ে বিপদের মুখে পড়েছে। সর্বোপরি এই পুকুরের অস্তিত্ব লোপাটের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য চরমভাবে বিঘ্ন হয়ে পড়ছে। এই সময়ে দেবদেবীকেন্দ্রিক পুকুর পরিবেশ বিপন্নকারী মানসিকতার মধ্যে ধরা না দিয়ে বরং পরিবেশ রক্ষাকারী হয়ে দেখা দেয়। এই অধ্যায়ে লৌকিক দেবদেবীর থানের মধ্যে লোকায়ত সমাজের পরিবেশ ভাবনার স্বরূপকে আলোচনা করা হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থান প্রাকৃতিকভাবে অবস্থানের মধ্য দিয়ে মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণের ভবনাকে প্রকাশ করে। এই দেবদেবীর থানকে পাকা বা ছাদযুক্ত করতে চাইলেও তা কোনোভাবে সম্ভব হয় না। এরমধ্য লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশ পায়। লৌকিক দেবদেবীর থান মাটির দেওয়াল, উপরে খড় বা টালির ছাদ দেখতে

পাওয়া যায়। গ্রামে যে সমস্ত থান দেখা যায় তার অধিকাংশ মাটির এবং এই থানগুলি এইভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে আছে। এই থানগুলিতে সারা বছর কোনো সংস্কার করা হয় না, কেবলমাত্র বাৎসরিক পুজোর দিনে এই থানকে মেরামত করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত থানকে কোনোভাবেই পাকা করা হয় না। মানুষের অর্থনৈতিক ও জীবনযাপনের উন্নতি আসা সত্ত্বেও এই সমস্ত থানকে পাকা ছাদযুক্ত করে স্থায়ী করা হয় না। লোকায়ত সমাজে এই সমস্ত থানকে পাকা না করা নিয়ে বহু আখ্যান পাওয়া যায় যেখান থেকে জানতে পারা যায় কেন এই সমস্ত দেবদেবীর থানকে পাকা করা হচ্ছে না বা কেন তারা দিনের পর দিন উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝেই থাকেন। আমরা জানি যে এই সমস্ত দেবদেবীর সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিবিড়। এই সমস্ত দেবতার পূজা-পদ্ধতি থেকে শুরু করে তাদের নানা বৈশিষ্ট্য সেই আদিম, কৌম ও অরণ্যচারী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে বহন করে। বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার কবলে পড়ে যখন সমস্ত কিছু যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নগরের পাকা ইমারতের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে। তখন এই সমস্ত দেবতারা পরিবেশের উন্মুক্ত আকাশের মাঝে নিজের আশ্রয় খুঁজে নেওয়ার মধ্যে নগর সভ্যতার প্রসারের বিরুদ্ধাচরণ করছে। আখ্যানে দেখা যায় এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবী খোলা আকাশের নীচে, ঝড়-বৃষ্টি ও রোদের মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন। এই দেবতারা কোনো বদ্ধতার মধ্যে থাকতে চান না। ফলে বলা যায় যে, দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবীর থান প্রাকৃতিকভাবে অবস্থানের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। এই দেবদেবীর থানের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে লোকায়ত মানুষের সর্বপ্রাণবাদের ধারণা দেখা যায়। থানের চারপাশের পরিবেশের সমস্ত জীবজ-অজীবজ প্রানকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে মানুষের সঙ্গে অন্য জীবকুলের সম্পর্কের খতিয়ান দেখতে ও বুঝতে চায়। আসলে মানুষ কেবল আধিপত্যের মানসিকতা নিয়ে অন্য জীবদের দেখছে কিনা নাকি, অন্য জীবদের প্রতি সমমর্যাদা নিয়ে দেখছে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে এই সমস্ত কিছুকে পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করে। উদাহারণ হিসাবে বলা যায় যে, থানের পাশে যে বৃক্ষ থাকে তাতে নানা প্রজাতির পাখি বাসা তৈরি করা ছাড়াও সেই বৃক্ষে মৌমাছি বাসা তৈরি করে। এই পাখি ও নানা পতঙ্গের বাসা বাঁধা নিয়ে তৈরি হওয়া আখ্যানে মানুষ এই সমস্তকে নিজের ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে না। এই বৃক্ষের সমস্ত প্রাণী বা পতঙ্গ স্বচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ

করে। ফলে থানে বসবাসকারী প্রানীর সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়। সর্প-ভীতি দক্ষিণবঙ্গের জলজঙ্গলের মানুষের কাছে নিত্য দিনের সমস্যা। মানুষ সাপের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকে পুজো করে থাকে। কিন্তু মানুষ নিজের ব্যবসায়িক চিন্তায় বা অর্থের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির সাপকে নির্বিচারে পাচার করে। এছাড়া সাপকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে তার চরম ক্ষতি করতে চায়। আর এই কারণে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ আজকে বিপন্নতার মুখোমুখি হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থানে সর্পকেন্দ্রিক আখ্যানগুলিতে সাপকে মানুষ ভক্তি সহকারে পুজো করে । বর্তমান সময়ে তক্ষক সাপ বিপন্ন কেবলমাত্র মানুষের কিছু স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবীর থানের পরিসরে এই সাপের আলাদা মর্যাদা আছে। আমরা দেখতে পাই যে, লৌকিক দেবদেবীর থানে এই সাপের অবাধ বিচরণ ও মানুষ তার ক্ষতি করে না। এবং তাকে পরম যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই যে থানের সঙ্গে জড়িত উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি মানুষের যে মানসিকতা তাতে আসলে পরিবেশের সমস্ত প্রাণকে সমান গুরুত্ব কথাই উচ্চারিত হয় । আজকের সময়ে যখন সবাই নিজের আধিপত্য নিয়েই চিন্তিত; সেখানে এই সমস্ত থানকেন্দ্রিক আখ্যান ও লোকায়ত মানুষের পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য অটুট থাকে। আদিম সময় থেকেই মানুষ বিশ্বাস করত যে, আকাশ, বৃষ্টি, ঝড়, গাছ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বন থেকে শুরু করে প্রকৃতির সমস্ত উপাদান নিছক কোনো জড় বিষয় নয়। আদিম মানুষ ভাবত প্রকৃতির সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনো না কোনো অলৌকিক শক্তি কাজ করছে। এই সমস্ত শক্তির উপরেই মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। ফলে মানুষ পরিবেশের সমস্ত বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। মানুষের এই ভাবনা থেকেই সর্বপ্রাণবাদের ধারণা জন্ম নিয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থানে ও এই সমস্ত দেবদেবী ঘিরে আখ্যানে আমরা দেখতে পাই যে, বৃক্ষ, পাথর, নুড়ি, কাঠ, মাটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপাদানকে মানুষ পুজো করছে। লৌকিক দেবদেবীর থানে এই ‘না-মানুষ’দের পুজোর মধ্য দিয়ে পরিবেশের সমস্ত কিছুকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মানসিকতা প্রকাশ পায়। কিছু আখ্যানে দেখা যায় লৌকিক দেবদেবী নিজেই লোকায়ত মানুষের পরিবেশ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসছেন। আসলে আমরা আগেই বলেছি যে, লোকায়ত সমাজ তাদের সমস্ত কিছু অসহয়তা এই সমস্ত দেবদবীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিরাপদে থাকতে চায়। নিজের অসহায়ত্বকে মানুষ তার পূজিত দেবতার

কাছে জানিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে চায়। ফলে লৌকিক দেবদেবীর আখ্যানে দেখা যায় প্রকৃতির সঙ্গে দেবদেবী নিজেই যুদ্ধ করছে যাতে লোকায়ত সমাজের পরিবেশ ঠিক থাকে। আমরা জানি দক্ষিণবঙ্গের বহু দ্বীপভূমি নদী দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে নদী যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তেমন করে নদী এখানকার মানুষের প্রতিদিনের সমস্যা। এখানকার দুর্বল নদী-বাঁধ ভেঙে বছরের নানা সময়ে জল ঢুকে গ্রামের জনজীবন ও পরিবেশকে নষ্ট করে। মানুষ এই সমস্যার সমাধান সব সময় করতে পারে না। মানুষ যখন এই প্রকৃতির সঙ্গে পেরে ওঠে না তখন তাদের পূজিত দেবদেবীর কাছে আশ্রয় নেয়। মানুষ বিশ্বাস করে তাদের এই সমস্যাকে সমাধান করবে তাদের পূজিত দেবদেবী। এবং আখ্যানে দেখা যায় যে, নদীর সঙ্গে দেবদেবী যুদ্ধ করছে যাতে নদীর জল গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবী সরাসরি লোকায়ত পরিবেশের রক্ষক হয়ে ওঠেন। বাংলায় যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবী পাওয়া যায় ও তাদের নিয়ে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান লোকায়ত সমাজে পালিত হয় তাতে মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক বিশ্বাস প্রবলভাবে যুক্ত আছে। আসলে দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর অধিকাংশ কৃষি-সহায়ক দেবতা, উর্বরতার দেবতা। ফলে এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করে মৌখিক আখ্যানে কৃষি ও উর্বরতার কথা উঠে এসেছে। বর্তমান সময়ে মানুষ অধিক মুনাফার জন্য কৃষি থেকে শুরু করে উৎপাদনের সমস্ত পরিসরে সার, কীটনাশকের ব্যবহার করছে। আর এর ফলে পরিবেশের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু লোকায়ত সমাজে মানুষ শস্য থেকে শুরু করে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান পেতে বিজ্ঞানের থেকে এই দেবদেবীর উপর বেশি নির্ভর করে। দেবদেবীর আখ্যানে তাই দেখা যায় যে, মানুষ বেশি শস্য পেতে বেনাকী ঠাকুরের পুজো করে ও পুকুর থেকে মাছ পেতে মাকাল ঠাকুরের পুজো করে। মানুষের এই বিশ্বাসের ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয় না। আধুনিক সময়ে মানুষ কোনো ভূমির বন্ধ্যা দশা ঘোচাবার জন্য নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই ভূমির উপর মানুষ আধিপত্য বিস্তার করছে, সেখানে লোকায়ত মানুষ এই সমস্ত দেবদেবীর কাছে আবেদন জানিয়ে নানা জাদু বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ভূমির উর্বরতকে বজায় রাখার কথা বলছে। আর এরমধ্যে লোকায়ত মানুষ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে যে আচার-অনুষ্ঠান লোকায়ত মানুষ পালন করে তার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃতিকে তুষ্ট করার মানসিকতা প্রকাশ পায়। লৌকিক দেবদেবীর থানে পশু-পাখির বলি প্রথা আদিম কাল থেকেই চলে আসছে। দেবদেবীর

থানে পশু-পাখির বলি দেওয়ার মধ্যে মানুষ তাদের পূজিত দেবদেবীকে তুষ্ট করে। দেবদেবীর থানে বলিদানের মধ্যে লোকায়ত মানুষের যে মানসিকতার প্রকাশ ঘটে তাতে উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা ধরা আছে। ফলে লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আখ্যান গড়ে উঠেছে তাতে লোকায়ত মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার কথাই উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রকৃতি লগ্ন হয়ে জীবনযাপনের মনোভাবের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। এছাড়া লৌকিক দেবদেবীর থানে মানুষের পালিত আচার-আচরণ ও উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাসের মধ্যে লোকায়ত মানুষ তার ঐতিহ্য লালিত প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলে চলে। লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নানা বিষয়ের মধ্যে মানুষের পরিবেশভাবনা প্রকাশিত হয়। বর্তমান সময়ে যখন সারা বিশ্বের পরিবেশ বিপন্নতার মুখোমুখি। মানুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কংক্রিটের জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। সেখানে দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আধুনিক সময়ের বিপরীত মানসিকতা দেখা যায়। আমরা এই দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্যে দেখতে পাই মানুষ দেবদেবীকে সামনে রেখে পরিবেশের সংরক্ষণের কথা বলছে। এই দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি, আচার-আচরণের মধ্যে মানুষ পরিবেশের সমস্ত প্রাণের সমান গুরুত্বের কথা বলছে ও তাকে সংরক্ষণের কথা উচ্চারণ করছে। ফলে বলা যায় যে, লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতিতে লোকায়ত মানুষ তাদের ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ইতিহাস বুনন করে চলেছে। থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা উচ্চারণ করে চলেছে।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থ

বাংলা

আহমেদ, ওয়াকিল। *বাংলার লোকসংস্কৃতি।* ঢাকা: বাংলা একাডেমি। ১৯৭৪।

ইন্দু, কমল। *ভারতীয় সামাজিক সমস্যা।* কলকাতা: বানী প্রকাশন। ২০০৮।

ইন্দুভূষণ, অধিকারী (সম্পা)। *লোকধর্ম: অতীত ও বর্তমান।* কলকাতা: পূর্বাদ্রি প্রকাশন। ১৯৮৯।

ইসলাম, মযহারুল। *লোককাহিনি সংগ্রহের ইতিহাস।* ঢাকা: স্টুডেন্টোয়েজ। ১৩৭৬।

গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১২।

ঘোষ, অমল কুমার। *বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৯।

ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি(চতুর্থ খণ্ড)।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৯৮৬।

ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি(তৃতীয় খণ্ড)।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৯৮০।

ঘোষ, বিনয়। *বাংলার সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৩৮৬।

ঘোষ, রীতা। *বাংলার লোককথার রূপতত্ত্ব ও স্বরূপ সন্ধান।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ২০০৩।

ঘোষ, শিপ্রা। *লোকসংস্কৃতির আঙিনায়।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৭।

চক্রবর্তী চিন্তাহরণ। *হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান।* কলকাতা: প্যাপিরাস। ১৩৭৭।

চক্রবর্তী, নিশীথ। *বৈদিক লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: এবং মুশায়েরা । ২০১০।

চক্রবর্তী, পার্থ। *প্রকৃতি পরিবেশ নিসর্গনীতি: রাজনৈতিক ও দার্শনিক অনুসন্ধান।* কলকাতা: সেতু। ২০১২।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার। *লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৪।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা)। *লোককথার সাত কাহন।* কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ২০১১।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *প্রসঙ্গ: লোকপুরাণ।* কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ১৯৯১।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *বাংলার লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৯।

চট্টোপাধ্যায়, ড. তুষার। *লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা।* কলকাতা: দে'জ। ২০০১।

চট্টোপাধ্যায়, তুষার। *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান।* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ। ১৯৮৫।

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *অগ্রন্থিত রচনা: দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব।* কলকাতা: অবভাস। ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, সাগর। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পূরাকীর্তি।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৫।

চট্টোপাধ্যায়, সৌগত(সম্পা)। *লোককথার বর্ণমালা।* কলকাতা: বঙ্গীয়সাহিত্য সংসদ। ২০১৪।

চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। *বাংলার নারী সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুনশ্চ। ২০০৩।

চৌধুরী, কমল। *প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান।* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৬০।

চৌধুরী, ড. সুকোমল। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। ১৯৯৭।

চৌধুরী, দুলাল। *বাংলার লোকউৎসব।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৫।

চৌধুরী, প্রমথ। *উত্তর চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত।* কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস। ১৯৮৭।

চৌধুরী, সাধনকমল। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। ২০০২।

ছাটুই, তুহিনময়। *লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণে পীর, গাজী, বিবি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)।* কলকাতা: ১৯৯৮।

জানা, মনীন্দ্রনাথ। *সুন্দরবনের সমাজ সংস্কৃতি।* কলকাতা: দিলীপ বুক হাউস। ১৯৮৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিন্নপত্রাবলী। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৯৬০।

দাস, বৃন্দাবন। *শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত।* কলকাতা: দে'জ। ১৯৯৫।

দেবনাথ, দোলা। *সাহিত্য বিচারে পরিবেশকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।* কলকাতা: গ্রন্থমিত্র, ২০১৩।

নন্দী চক্রবর্তী, কবিতা। *বাংলাসাহিত্যে পরিবেশচেতনা।* কলকাতা: আশাদীপ। ২০১৭।

নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজ সংস্কৃতি।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৮।

বসাক, শীলা। *বাংলার কিংবদন্তি।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী। ১৯৬৬।

বাগচী, দীপক কুমার। *ভারতীয় দর্শন।* কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক। ১৯৯৭।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা)। *লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০০৮।

বিশ্বাস, মন্টু। *সুন্দরবনের লোককথা।* কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী। ২০১২।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার-লোকসংকৃতি।* নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল বুকি ট্রাস্ট। ২০০৫।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ধর্ম ও সংস্কৃতি: প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট।* কলকাতা: আনন্দ। ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, মিহির (সম্পা) । *লোকশ্রুতি।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসীবাসী কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ১৯৯৯।

ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা)। *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী।* কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৮।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ১৩৯৪।

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। *হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।* কলকাতা: ফার্মা কেএল এম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮০।

ভুক্ত, অনিন্দ্য। *পরিবেশ প্রসঙ্গ: তত্ত্বে ও তথ্যে।* কলকাতা: মিত্রম। ২০০৬।

মজুমদার, তুলিকা। *বাংলার বনদেবতা।* কলকাত: লক্ষী নারায়ণ প্রেস। ২০০৭।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *আদিবাসী প্রেমের লোককথা।* কলকাতা: এবং মুশায়েরা।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *আদিবাসী মিথকথা।* কলকাতা: পরম্পরা। ২০১৩।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *লোককথার ঐতিহ্য।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৬।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *লোককথার টাইপ মোটিফ ইনডেকস।* কলকাতা: গাঙচিল। ২০১২।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *লোককথার লিখিত ঐতিহ্য।* কলকাতা: গাঙচিল। ২০০৯।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ও লোকায়ত মন।* কলকাতা: গাঙচিল। ২০১০।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ।* বারুইপুর: ১৯৯৭।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়।* কলকাতা: নব চলন্তিকা। ১৯৯৯।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য।* কলকতা: নব চলন্তিকা। ২০১০।

মণ্ডল, বরেন্দু (সম্পা)। *দ্বীপভূমি সুন্দরবন।* কলকাতা: ছোঁয়া। ২০২০।

মণ্ডল, সুজিত কুমার (সম্পা)। *বনবিবির পালা।* কলকাতা: গাঙচিল। ২০১০।

সরকার, কল্যাণ কুমার। *পরিবেশবিদ্যাবাদ পরিবেশ ও রাজনীতি: বিদেশ-বিশ্ব ও ভারতবর্ষ একটি অনুসন্ধিৎসু বীক্ষা।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০১৫।

সরকার, প্রণব। *বাংলার লোকসমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: লোক। ২০১৩।

সরকার, রেবতীমোহন। *লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যা।* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০৫।

সাঁতরা, তারাপদ। *কলকাতার মন্দির, স্থাপত্য, অলংকরণ, রূপান্তর।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০০২।

সাঁতরা, তারাপদ। *পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য: মন্দির ও মসজিদ।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ১৯৯৮।

সাহা, সঞ্জীব। *ধর্মীয় উদ্ভিদ লোককথা, সংস্কৃতি ও আধুনিক বিজ্ঞান (১) ।* কলকাতা: কানন প্রকাশনী। ২০১৩।

সাহা, সঞ্জীব। *ধর্মীয় উদ্ভিদ লোককথা, সংস্কৃতি ও আধুনিক বিজ্ঞান (২) ।* কলকাতা: কানন প্রকাশনী। ২০১৪।

সুর, সুজিত। *বনবিবি- উৎস সন্ধানে।* কলকাতা: লোকলৌকিক প্রকাশনী। ১৩৮৮।

সেন, অঞ্জন ও সিংহ উদয়নারায়ণ (সম্পা)। *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি।* কলকাতা: ভাষা বন্ধন প্রকাশনী। ১৯৯১।

সেন, অতুলচন্দ্র, তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ও ঘোষ, মহেশচন্দ্র (অনুদিত ও সম্পাদিত)। কলকাতা: *উপনিষদ।* হরফ প্রকাশনী। ২০১০।

সেন, গোপীনাথ। *পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৩৯৪।

সেন, সৌমেন। *লোকসংস্কৃতির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসীবাসী কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৩।

সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পা)। *লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮২।

সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৫।

সেনগুপ্ত, পল্লব। *পূজা পার্বণের উৎসকথা।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৩৯১।

হাবিব, ইরফান। *মানুষ ও পরিবেশ: ভারতবর্ষের বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০১৫।

হালদার, বিমলেন্দু। *দক্ষিণবঙ্গের জনসংস্কৃতি ও ইতিহাস বিচিত্রা(প্রথম খণ্ড)।* কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া। ২০০১।

হালদার, মঞ্জু। *প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য।* কলকাতা: উর্বী প্রকাশনী। ২০১৩।

হোসেন, মোহা.। মোশাররফ। *প্রসঙ্গ পুরাকীর্তি।* ঢাকা: দিব্য প্রকাশ। ২০১২।

ইংরেজি

Buell, Lawrence. *The Enviornmental Imagination: Thoreau, Nature writing and Formation Of American Culture.* Havard University Press. 1995.

Carson, Rachel. *Silent Spring.* London: Penguin Classics. 2000.

Frederick O, Waage (ed.). *Teaching environmental Literature: Materials, Methods, resources.* New York: MLA. 1985.

Garrard Greg, I. *Beginning: Pollution, Ecocriticism.* London & New York: Routledge. 2007.

Garrard, Greg(ed.). *The Oxford Handbook of Ecocriticism.* New York: Oxford University press. 2014.

Glotfelty, Cheryll and Harold, From (eds.) *The Ecocritism Reader: Landmarks in Literary Ecology.* London: University of Georgia. 1996.

Huggan, Graham & Tiffin, Helen. *Post Colonial Ecocriticism: Literature, animal, Environment*. London & New York: Rouledge. 2010.

Kerridge, Richard. *Environmentalism and Ecocriticism: Literary Therory and Criticism*. New York: Oxford University Press. 2007.

Love, Glean A. *Practical Ecocriticism: Literature, Biology and Environment*. London: University Of Virginia Press. 2003.

Waugh, Patricia (ed.) *Literary Theory and criticism.* New York: Oxford University Press. 2006.

প্রবন্ধ

ঘোষ, দিলীপ। 'জটার দেউল এক অনন্য স্থাপত্য কীর্তি'। *সুচেতনা,* ৪০ তম সংকলন। বারুইপুর। ২০১৬।

ঘোষ, সঞ্জয়। 'জটার দেউল: সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোন থেকে'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* তৃতীয় সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৫।

চৌধুরী, ড. দুলাল। 'দক্ষিণরায়'। *বাঘ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮০।

দাস, ড. গৌতম কুমার। 'সুন্দরবনের জলবায়, প্রকৃতি ও পরিসংখ্যান'। নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, তৃতীয় সংখ্যা। ২০০৩।

নস্কর, দেবব্রত। 'রায়দিঘি কঙ্কনদীঘী ও লুপ্ততীর্থ জটা'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* চতুর্থ সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৩।

নস্কর, ধুর্জটি। 'সুন্দরবনের গ্রামদেবতা ও সর্বজনীন মেলা-উৎসব'। *শ্রীখণ্ড সুন্দরবন।* কলকাতা: দীপ প্রকাশন। ২০০৫।

নস্কর, ধূর্জটি। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন: শৈবপ্রভাব ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* চতুর্থ সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৬।

নস্কর, ধূর্জটি। 'সুন্দরবনের লোকজীবন ও লোকসংকৃতি'। *সুচেতনা,* দ্বিতীয় সংখ্যা। বারুইপুর: তিতীর্ষা গ্রাফিস্ক সেন্টার। ২০১৪।

পত্রনবীশ, সৈকত। 'বোধিবৃক্ষ'। *সুন্দরবনের মুখ,* চতুর্থ সংখ্যা। ক্যানিং: সুন্দরবন অনুভব। ২০১৫।

পুরকাইত, দেবাংশু। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেলাআ ও উৎসব: আলিদার বিবিমার মেলা'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* নদী সংখ্যা-৭, চতুর্দশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৪।

পেয়াদা, দেবপ্রসাদ। 'দারুময়ী দূর্গা, বিশালাক্ষী ও অন্যান্য দেবী এবং কিংবদন্তি'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* বিংশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৭।

বসু, প্রসেনজিৎ। 'ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির: কিংবদন্তি-সমীক্ষা'। *সাহিত্যতক্কো।* বারাসাত: মিলেনিয়াম প্রিন্টার্স। ২০১৩।

বাগ, রাধানাগ। 'বিবাহিত বট-অশ্বত্থ'। *লোকপরিচয়।* বাখরাহাট: লোকপরিচয় গবেষণা পরিষদ। ২০১৪।

ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ। 'নিম্নবঙ্গের ব্যাঘ্র-বিশ্বাস ও সাহিত্য। *বাঘ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮০।

ভট্টাচার্য, নন্দদুলাল। 'সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে'। *শ্রীখণ্ড সুন্দরবন।* কলকাতা: দীপ প্রকাশন। ২০০৫।

ভূঞ্যা, ফাল্গুনি। 'বনবিবি পালাগানঃ বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের স্বরূপ নির্ণয়ে একটি মনঃসমীক্ষণ'। *সমকালের জিয়নকাঠি,* দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস। ২০০৮।

মজুমদার, মেহেন। 'আটঘরার দমদমা ঢিপি আর কালিদাস দত্তের অনুপ্রেরণা টেনে নিয়ে গেল স্থানীয় ইতিহাস চর্চা'। *সুচেতনা* (দ্বিতীয় সংখ্যা)। রাজগড়া: তিতীর্ষা গ্রাফিস্ক সেন্টার। ২০১২।

মণ্ডল, অজয়। 'ক্ষেত্রানুসন্ধানে আলোকে সন্দেশখালির চড়ক'। *অভিযাত্রী ফেরী: লোকউৎসব সংখ্যা,* প্রথম সংখ্যা। কলকাতা: ফেরী। ২০১২।

মণ্ডল, অঞ্জলি বিকাশ। 'সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতিঃ বনজীবী সম্প্রদায়ের দেবদেবী-বনবিবি ও দক্ষিণরায়'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র: জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-১,*ষষ্ঠ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১০।

মণ্ডল, উত্তম কুমার। 'সুন্দরবন: আদিবাসী সংস্কৃতির সংকট'। *সমকালের জিয়নকাঠি* (যুগ্ম সংখ্যা)। বারুইপুর: এল টি এম গ্রাফিস্ক। ২০১৫।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মন্দির শিল্প: কেশবেশ্বর মন্দির'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র।* ২০০২।

মণ্ডল, গৌতম। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 'দ্বীপচণ্ডী' আসলে নারায়ণীতলার 'নারায়ণী'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* দ্বিতীয় সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৩।

মণ্ডল, জীবন। 'জাঁতাল মেল'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৪।

মণ্ডল, শৈলেন্দ্রনাথ। 'সুন্দরবনের মেলা ও উৎসব: কাশীপুরের ধর্মের জাতের মেলা'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* নদী সংখ্যা-৭, চতুর্দশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৪।

মিত্র, সনৎকুমার। 'দক্ষিণবঙ্গের লোকদেবতা বাঘ'। *বাঘ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮০।

মিদ্যা, দেবীশংকর। 'জটার দেউল'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* দ্বিতীয় সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৩।

মিদ্যা, দেবীশঙ্কর। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবী: বেনাকি'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* চতুর্থ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০০৪।

মিদ্যা, দেবীশঙ্কর। 'মাকাল ঠাকুর: প্রত্ন সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* পঞ্চম সংখ্যা। সোনারপুর। ২০০৫।

মিস্ত্রি, ড. সুভাষ। 'সুন্দরবনের লৌকিক দেবী বনবিবি: একটি পর্যালোচনা'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* পঞ্চম সংখ্যা। সোনারপুর। ২০০৫।

মৃধা, শশাঙ্ক শেখর। 'সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি,* সংখ্যা-৬, ত্রয়োদশ সংখ্যা। ২০১৩।

রমা, মণ্ডল। 'পরিবেশ আন্দোলনে নারীর ভূমিকা'। *ঋতবীনা: বিশ্ব পরিবেশ ভাবনা।* কলকাতা: ইন্টারন্যাশানাল প্রিন্টিং। ২০০৯।

সরকার, প্রদ্যুৎ। 'বারাঠাকুর'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* দ্বাবিংশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৮।

সরদার, প্রদ্যুৎ কুমার। 'সুন্দরবনের মেরীগঞ্জ অঞ্চলের লোকায়ত জীবন ও গ্রামীন সংস্কৃতি'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* তৃতীয় সংখ্যা। ২০০৩।

সরদার, মায়ারানী। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং সুন্দরবনের লোকদেবতাও উৎসব: ধর্মঠাকুর ও ধর্মের জাত'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* দ্বাবিংশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৮।

সর্দার, সত্যচরণ। 'সুন্দরবনের নদীতীরে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* নদী সংখ্যা-৩, চতুর্থ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০০৯।

সিরাজ, সাজাহান। 'সুন্দরবনের মেলা, পার্বণ ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন'। *শ্রীখণ্ড সুন্দরবন।* কলকাতা: দীপ প্রকাশন। ২০০৫।

সেনগুপ্ত, প্রদীপকুমার। 'পরিবেশ উন্নয়ন ও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি'। *ঋতবীনা: বিশ্ব পরিবেশ ভাবনা।* কলকাতা: ইন্টারন্যাশানাল প্রিন্টিং। ২০০৯।

হালদার, বিমেলেন্দু। 'সুন্দরবনের লোকাচারঃ পূজা পার্বণে-গাছড়া-লতা-পাতার ব্যবহার'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি,* সংখ্যা-৬, ত্রয়োদশ সংখ্যা। ২০১৩।

পত্রিকা

চট্টোপাধ্যায়, অর্ঘ্যচন্দন। *জটার দেউল এর ইতিবৃত্ত।* কুলতলী: প্রভাবতী অফসেট প্রিন্টার্স। ২০১২।

চৌধুরি কামিল্যা, মিহির। *রাঢের লৌকিক দেবদেবী।* লোকদর্পণ (প্রথম সংখ্যা)। নদীয়া: লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫।

ছাটুই, সন্তোষ কুমার। *ময়দা ও ময়দার পাতালভেদী কালী।* দক্ষিণা কালীবাড়ী উন্নয়ন কমিটি।

দাস, আনন্দ। *সুন্দরবনের অঞ্চলিক ইতিহাস,* সুন্দরবন সংখ্যা-৭। ক্যানিং: অধিকারী প্রিন্টিং সেন্টার।

পাল, সত্যব্রত (সম্পা)। *সোনারপুরের ইতিহাস।* সোনারপুর: অনুভব প্রকাশনী। ২০০৪।

মণ্ডল, শ্যামাপদ। আয়ত: গাছপালা বিশেষ সংখ্যা। কলকাতা: মাইতি ডিটিপি। ২০১৩।

সরকার, প্রণব। *সংবাদপত্রে সেকালের মেলা ও উৎসব।* কলকাতা: পদ্মনাভ ইমপ্রেশান। ২০১০।

সরকার, প্রণব। *সুন্দরবনের আঞ্চলিক জীবন, বিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: পদ্মনাভ ইম্প্রেশান। ২০১০।

Signature of Supervisor

Signature of Researcher